দাম : ৭০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা ঃ ১৪২১
২২ সেপ্টেম্বর - ২০১৪

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ৫ আশ্বিন, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

২২ সেপ্টেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ৭০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

দেবীবন্দনা

দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা — **স্বামী অরুণানন্দ : ১৩**

দিব্যজীবন

গৌরীমা — **সবুজকলি সেন : ১৭**

উপন্যাস

জল রংয়ে আঁকা ছবি মুছে যায় —**সুমিত্রা ঘোষ : ৭৭**

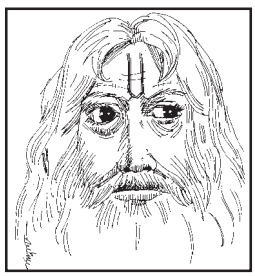

তন্ত্রাচার্যের ডায়েরি — **শেখর সেনগুপ্ত : ১৩৩**

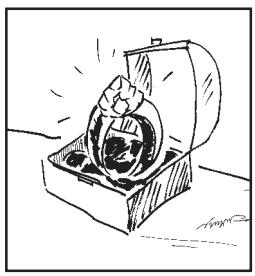

হীরের আংটি — **সৌমিক ঘোষ : ২৬৯**

গল্প

শেষ বয়সের গল্প —**রমানাথ রায়** : ২৯

ধাইমা — **গোপালকৃষ্ণ রায়** : ৫৩

সেকেলে ডাকাতের নীতি — **শেখর বসু** : ৬৭

ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো — **তপন বন্দ্যোপাধ্যায়** : ১১৫

ইয়েস স্যার — **সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত** : ১৫৯

সাদা হাতির কালো মাহুত — **জিষ্ণু বসু** : ২০৩

ভ্যানিসিং পাউডার — **মেখলা মিত্র** : ২৫৫

মরণ ছুঁয়ে — **মৃগাঙ্ক কৃষ্ণ রায়** : ২৫৯

আর্তদিন — **সুনীল আচার্য** : ৩১৩

রম্যরচনা

নিজের রাজ্য, নিজের বাঙালি — **চণ্ডী লাহিড়ী** : ১৭৯

বিচিত্র রচনা

চড়াই তুমি ভালো থেকো — **তাপস অধিকারী** : ১৮৩

স্টেশনের কথা — **সুন্দর মৌলিক** : ২২৯

প্রবন্ধ

হিন্দু ধর্ম ও বর্তমান বিশ্ব — **ড. তুষার কান্তি ঘোষ** : ২৩

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চিত্তরঞ্জন সুতারের অবদান — **অচিন্ত্য বিশ্বাস** : ৩৭

ইসলামে নারীর স্থান : আফজল খাঁ ও তার ৬৩ জন বিবির হৃদয়বিদারক উপাখ্যান — **ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী** : ৪৯

কেন এই ধর্ষণ বন্যা? — **তথাগত রায়** : ৬১

সার্ধশতবর্ষে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর : ঐতিহ্য, আধুনিকতা, বিজ্ঞান সাধনা ও স্বদেশ চেতনা — **ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়** : ১০৩

আমাদের সার্বিক অবক্ষয়ের কারণ : জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে ব্যর্থতা — **দেবীপ্রসাদ রায়** : ১০৭

হিন্দুত্বের রক্ষক দেবেন্দ্রনাথ — **রবিরঞ্জন সেন** : ১২৩

বিপন্ন ঐতিহ্য, বিপন্ন সভ্যতা — **বাসুদেব ধর** : ১৬৭

বাংলা-ব্রহ্মদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক — **অরিন্দম মুখোপাধ্যায়** : ১৭৫

ভারতীয় চলচ্চিত্রে জাতীয়তাবাদ — **সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়** : ২১১

কলকাতার পেশাদারি থিয়েটারের উত্থান ও পতন — **গোপাল চক্রবর্তী** : ২১৭

আজিবক তীর্থ — বরাবর ও নাগার্জুন পাহাড় — **সৌমেন নিয়োগী** : ২৩৭

বই বৈ তো নয় — **অর্ণব নাগ** : ২৪৩

যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোয় জন্মান্তরবাদ — **ড. গোপেশচন্দ্র সরকার** : ২৫১

জীবনকথা

এক অপরাজেয় যোদ্ধা — **বিজয় আঢ্য** : ১৯৫

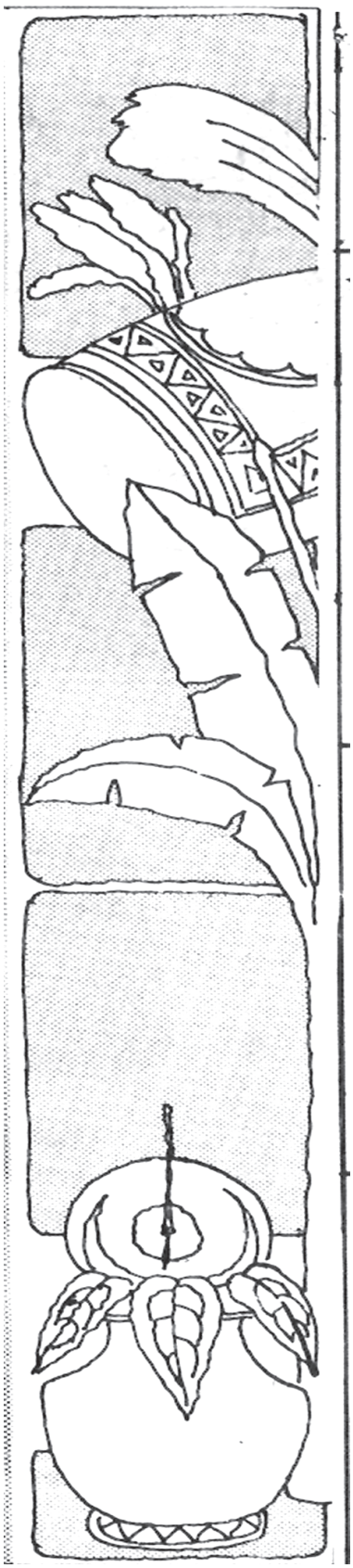

দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা

স্বামী অরুণানন্দ

জনৈক ভক্তকবি লিখেছেন—

"মা এসেছেন বাপের বাড়ী, মাথায় মুকুট দোলে।
অসুর বেটা পড়ে আছে, মায়ের পদতলে।।
বীণাটি হাতে বীণাপাণি, ঐ যে মায়ের পাশে।
পদ্মের উপর লক্ষ্মী দিদি, মৃদু মৃদু হাসে।।
ময়ূর চড়ে কার্তিক দাদা, বীর হয়েছে বড়।
ভয় পেয়ে তাই সিংহমামা, লেজ করেছে জড়।।
পেটটি মোটা গণেশ দাদা, শুঁড় তুলেছে দড়।
পায়ের তলায় ইঁদুর ভায়া, ভয়ে জড়সড়।।
মাথার উপর দেবাদিদেব, ধ্যানে আছেন মত্ত।
মায়ের এ-রূপ দেখে সবাই, আনন্দে উন্মত্ত।।"

মায়ের এরূপ শান্ত, সুন্দর ঘরোয়া রূপ দেখিতেই বাঙালি ভক্তগণ অভ্যস্ত। শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা সমগ্র হিন্দুজাতির বিশেষত বাঙালি হিন্দুদের জাতীয় মহোৎসব। সারা বছর তারা এই দিনগুলির

দিকেই তাকিয়ে থাকে। এই মহাপূজা উপলক্ষে দেশ-বিদেশ থেকে আত্মীয়-স্বজনরা গৃহে একত্রিত হয় এবং আনন্দে উৎসবে মেতে উঠে। শুধুমাত্র আমাদের ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে, যেখানে বাঙালি হিন্দুগণ আছেন, সেখানেই এই মহোৎসব মহা ধূমধামে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই দুর্গাপূজার উৎস কোথায়?

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে— অতি প্রাচীনকালে দ্বিতীয় মনুর রাজত্বকালে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য স্বীয় স্বীয় মন্ত্রী ও আত্মীয়গণের দ্বারা প্রতারিত ও বিতাড়িত হয়ে মনের দুঃখে বনে গমন করেন। সেখানে মেধস্ মুনির আশ্রমে গিয়ে নিজেদের দুঃখের করুণ কাহিনী নিবেদন করে তার কারণ জানতে চান। মুনি বলেন, এসমস্তই দেবী মহামায়ার খেলা। তাঁরই মায়া প্রভাবে জীব পরম সত্যবস্তু শ্রীভগবানকে বিস্মৃত হয়ে ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের মোহে পড়ে দুঃখকষ্ট পায়। তখন রাজা সুরথ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রূবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ।।

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১/৫৪

— অর্থাৎ ভগবন, আপনি যাঁকে মহামায়া (মা দুর্গা) বলছেন, সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্ন হন এবং তাঁর কর্মই বা কি?

উত্তরে ঋষি বললেন— সেই দেবী মহামায়া বা দেবী দুর্গা নিত্যা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-রহিতা; তিনি জগন্মূর্তি অর্থাৎ এই জগৎ প্রপঞ্চই তাঁর বিরাট মূর্তি এবং তিনি সর্বব্যাপিনী অর্থাৎ তাঁর দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।

—ঐ, ১/৫৭

— তাঁকে ভক্তিসহকারে পূজা করলে তিনি কৃপাপূর্বক এই মায়ার বন্ধন থেকে জীবকে মুক্তিদান করেন। তারপর সেই ঋষির নির্দেশে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য দুইজনে একত্র হয়ে মায়ের পূজা করেছিলেন।

পূজিতা সুরথেনাদৌ দেবী দুর্গতিনাশিনী।
মধুমাস-সিতাষ্টম্যাং নবম্যাং বিধিপূর্বকম্।।

—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

আদিতে অর্থাৎ সর্বপ্রথমে রাজা সুরথ শাস্ত্র বিধিমতে চৈত্র মাসে শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার পূজা করেছিলেন। মাতা দুর্গাদেবীর অর্চনা করে রাজা সুরথ রাজ্য, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেছিলেন এবং সমাধি বৈশ্য মায়ের কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তি লাভ করেছিলেন। এই বাসন্তী পূজার কাহিনী শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সংক্ষেপে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে অকালবোধন করে জগন্মাতা মা দুর্গার পূজাপূর্বক দুর্দান্ত শত্রু রাক্ষসরাজ রাবণকে নিহত করে মা সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন। এই পূজাই জগতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। দেবী ভাগবতে ও কালিকাপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের পূজার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

জগতে যত কিছু সৎকার্য প্রবর্তিত হয়েছে, সে সকলের মূলে রয়েছেন— দেবতা ও মানুষ। কিন্তু এঁদের মধ্যে প্রভেদও আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে দিন ও রাত্রির সময়। মানুষের দিন হয় বার (১২) ঘণ্টায় এবং রাত্রিও হয় বার (১২) ঘণ্টায়। আর দেবতাদের দিন হয় ছয় মাসে এবং রাত্রিও হয় ছয় মাসে। আমাদের মাঘ মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত— এই ছয় মাস দেবতাদের দিন এবং শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাসের শেষ পর্যন্ত— এই ছয় মাস দেবতাদের রাত্রি। দেবতাদের দিনকে বলা হয় উত্তরায়ণ এবং রাত্রিকে বলা হয় দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে দেবতারা জাগ্রত থাকেন এবং দক্ষিণায়নে তাঁরা নিদ্রিত থাকেন।

শরৎকাল বা আশ্বিন মাস পড়ে দক্ষিণায়নের মধ্যে। তখন দেবী দুর্গা নিদ্রিতা থাকেন। সেজন্য তখন তাঁকে পূজা করতে হলে দেবীর জাগরণের জন্য বোধন করতে হয়। বোধন শব্দের অর্থ জাগরণ। আর বসন্তকাল পড়ে উত্তরায়ণের মধ্যে। তখন তো দেবী দুর্গা জাগ্রত থাকেন। সেজন্য বাসন্তী পূজায় দেবীর বোধনের প্রয়োজন হয় না। বাসন্তী পূজা কালোচিত পূজা এবং শারদীয়া পূজা অকাল পূজা নামে কথিত হয়। কিন্তু অকাল পূজা বলেও আমরা দুর্গাপূজা বলতে এই শারদীয়া পূজাকেই মহাপূজা বলে মনে করি এবং এই পূজাই আমাদের জাতীয় মহাপূজা।

বিভিন্ন পুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের এই পূজার কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অথচ বাল্মীকি রামায়ণে এই পূজার কথা বিশেষভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব ও অকাল বোধন, রাবণ বধে দুর্গাপূজার জন্য মহাবীর হনুমান কর্তৃক ১০৮টি নীলপদ্ম আনয়ন এবং একটি পদ্ম কম পড়ায় শ্রীরামচন্দ্রের চক্ষু উৎপাটন করতে যাওয়া প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কবি কৃত্তিবাস এই সব কাহিনী কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানি না। কিন্তু তাঁর অমর লেখনীতে ভক্তির যে নির্ঝরিণী বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে তার পূত প্রবাহে সমগ্র দেশ আজ পবিত্র হয়েছে— তা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। জগন্মাতা মা দুর্গার পূজায় শ্রীরামচন্দ্রের নয়নপদ্ম উৎপাটনের যে করুণ চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন, ভক্তির এমন মর্মস্পর্শী চিত্র, আত্মসমর্পণের এমন মহান ভাব আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

অসময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় দেবতারা শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গল কামনায় মহা চিন্তায় পড়লেন। তাঁরা পিতামহ ব্রহ্মার পরামর্শ প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা বললেন— আদ্যাশক্তি মহামায়ার (মা দুর্গার) কৃপা ব্যতীত রাবণ বধ সম্ভব নয়। কিন্তু

দেবী তখন নিদ্রিতা। তাঁকে জাগ্রতা করার জন্য দেবগণ ব্রহ্মার সঙ্গে দেবীর স্তব করলেন। স্তবে সন্তুষ্টা হয়ে দেবী কৌমারী মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন--- আপনারা বিল্ববৃক্ষমূলে জগন্মাতার বোধন করুন। আপনাদের প্রার্থনার দেবী জাগ্রতা হলে তাঁকে যথাবিধি অর্চনা করলে শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধি হবে।

পিতামহ ব্রহ্মা মর্ত্যে এসে নির্জন স্থানে একটি বিল্ববৃক্ষের সবুজ ঘন পত্ররাশির মধ্যে একটি অপূর্ব সুন্দরী বালিকাকে নিদ্রিতা দেখেন। তাঁকেই জগজ্জননী জেনে ব্রহ্মা দেবগণসহ তাঁর বোধনস্তব করেন। দেবতাদের স্তবে দেবী প্রবুদ্ধা হলেন। তখন তিনি তাঁর বালিকা মূর্তি ত্যাগ করে দেবী চণ্ডিকারূপে অভিব্যক্ত হলেন। ব্রহ্মা বললেন— মাতঃ, আমরা রাবণবধের নিমিত্ত এবং শ্রীরামচন্দ্রকে অনুগ্রহ করার জন্য অকালে আপনাকে জাগ্রত করেছি—

''রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।''

আপনি কৃপাপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বশক্তিদিয়ে রাবণবধে সহায়তা করুন।

দেবী বললেন— আমি শারদীয়া শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য ধনুর্বাণে প্রবেশ করব। অষ্টমীতে রাম ও রাবণের ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ হবে। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণ নিহত হবে। এটাই সন্ধিক্ষণ বা সন্ধিপূজা। আর দশমীতে শ্রীরামচন্দ্র বিজয়োৎসব করবেন। বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত পূজাবিধি দেবী নিজেই দেবগণকে জানিয়ে দিলেন।

স্বনামধন্য স্মৃতি শাস্ত্রকার পণ্ডিত রঘুনন্দনের স্মৃতিতে দুর্গোৎসবের ছয়টি কল্প বিধান আছে। তন্মধ্যে আমাদের এই বঙ্গদেশে ষষ্ঠ্যাদিকল্প প্রচলিত। সেই কল্প অনুসারে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাকালে বিল্ববৃক্ষের শাখায় দেবীর বোধন হয়। তৎপরে আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। এদিনকার পূজা হয় ঘটে। তারপর সপ্তমী থেকে তিনদিন মৃন্ময় প্রতিমায় দেবীর পূজা হয়। শ্রীরামচন্দ্রের এই দুর্গোৎসব স্মরণ করেই বর্তমানে আমাদের এই শারদীয়া মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রই রাবণ বধের জন্য সর্বপ্রথম শরৎকালে দেবী দুর্গার অকাল বোধন ও পূজা করেন। তখন থেকেই এই শারদীয়া পূজা প্রচলিত। পরবর্তীকালে ইং ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা কংসনারায়ণ তখনকার দিনে প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে মহা ধুমধামে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন। রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজ পুরোহিত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রমেশ শাস্ত্রী মহাশয় দুর্গাপূজার পদ্ধতি লিখেছিলেন।

জগন্মাতা মা দুর্গা বা মহামায়া বিশ্বব্যাপিনী হলেও নারীমূর্তিতে তাঁর সমধিক প্রকাশ। নারী মাত্রেই দেবীর অংশ এবং সকল স্ত্রীলোকই মাতা জগদম্বার জীবন্ত প্রতিমূর্তি—

''স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু''— শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১/৬

সুতরাং প্রত্যেক নারীতে মাতৃবুদ্ধি করা এবং সকল নারীকে

দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করাই মহামায়া মা দুর্গার শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

মা দুর্গার আবির্ভাব কাহিনী

অতি প্রাচীনকালে অসুররাজ মহিষাসুরের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের স্বর্গরাজ্যের অধিকার নিয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে পরাজিত দেবগণ ভগবান ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করে শিব ও বিষ্ণুর নিকট গিয়ে তাঁদের নিজেদের দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে বলেন। তাঁদের কথা শুনে ভগবান বিষ্ণু ও শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁদের মুখ থেকে মহাতেজ বের হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্রুদ্ধ দেবগণের শরীর থেকেও বিপুল তেজ বের হয়। সেই তেজসমূহ একত্রে জমাট বেঁধে একটি অপূর্ব সুন্দরী দেবীমূর্তি ধারণ করে। এক এক দেবতার তেজ থেকে সেই দেবীর এক একটি অঙ্গ উৎপন্ন হয়। ইনিই জগন্মাতা মা দুর্গা।

তখন দেবগণ ভগবান ব্রহ্মার আদেশে নিজ নিজ অস্ত্র থেকে আরও একটি অস্ত্র সৃষ্টি করে সেই দেবীকে দিলেন। সমুদ্র তাঁকে নানারকম বস্ত্র ও অলঙ্কারে সাজালেন এবং হিমালয় পর্বত তাঁর বাহনরূপে একটি দুর্জয় সিংহ দিলেন। এভাবে দেবী দুর্গা বা মহামায়ার আবির্ভাব হলে তাঁর তেজে সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হল। এভাবেই মা দুর্গার শুভ আবির্ভাব হয়। এই ঘটনা ঘটেছিল সুউচ্চ হিমালয় পর্বতের কাত্যায়নী আশ্রমে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এভাবে মা দুর্গার আবির্ভাব কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী, ২/১-৩২

আগেকার দিনে মহা ধুমধামে এবং খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে মা দুর্গার পূজা বা দেবী আরাধনা অনুষ্ঠিত হত। এটি হিন্দুগণের জাতীয় শ্রেষ্ঠ পূজা। কিন্তু বর্তমান যুগে সেই পূজা একটি স্ফূর্তিতে পরিণত হয়েছে। বাহ্য আড়ম্বর খুব বেশি হয়, কিন্তু ভাব-ভক্তি-নিষ্ঠা তেমন দেখা যায় না। সেজন্য আমরা সার্বজনীন এত পূজা উৎসব করেও মায়ের আশীর্বাদ ও শক্তি লাভ করতে পারি না।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহান প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ সেজন্য 'জাতীয় জীবনে শক্তি সঞ্চার' প্রবর্তনের জন্য ইং ১৯২৮ খৃস্টাব্দে তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীধামে শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব তথা মহাশক্তির পূজা প্রবর্তন করেন। তিনি সমগ্র হিন্দু জাতিকে কম্বুকণ্ঠে ডাক দিয়ে বলেন— ''হিন্দু, তুমি কি জান না যে তুমি শক্তির পূজক, মহাশক্তির উপাসক? তোমার সেই শক্তির সাধনা কোথায়? ধীর, স্থির হইয়া চিন্তা কর— তোমার উপাস্য দেবদেবীর সেই মহাবীরত্বমূলক লীলাভিনয়। শিবের হাতে ত্রিশূল, তাহা দেখিয়া তুমি কি চিন্তা করিবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন চক্র, শ্রীরামচন্দ্রের হাতে ধনুর্বাণ— তাহা দেখিয়া তুমি কি ভাবনা ভাবিবে? মা-কালীর হাতে রক্তাক্ত খড়্গ, মাতা দুর্গার দশহস্তে দশ প্রহরণ— তাঁদের দিকে তাকাইয়া তোমার ভিতর কি চিন্তা আসিবে? এই সকল মহাশক্তির সাধনা করিয়া কি মানুষ দুর্বল হয়, না সবল হয়?''

''হিন্দু, একবার বিশেষভাবে এই সমস্ত কথা চিন্তা কর। তারপর তুমি ভাবিয়া ও বুঝিয়া দেখ, তোমার শক্তির পূজারাধনা ও সাধনা ঠিকঠিক হইতেছে কিনা। যদি না হইয়া থাকে, তবে ঠিক কর যে— এখন হইতে কীভাবে তুমি তোমার আরাধ্য দেবদেবীর পূজা ও উপাসনা করিবে।''

সঙ্ঘনেতা আচার্যদেব বলেছেন— ''মা দুর্গার পূজা আমাদের জাতীয় পূজা এবং জাতির শক্তিলাভের উপায়। শ্রীশ্রীমায়ের বাস্তব রূপ কি? তাঁর বাস্তব রূপ হচ্ছে— বিরাট হিন্দু সমাজ। মায়ের চারিটি সন্তান— সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক ও গণেশ। এঁরা হচ্ছেন হিন্দুধর্মের চারটি বর্ণ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রতীক। মা সরস্বতী হলেন ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রতীক। দেব সেনাপতি কার্তিক হচ্ছেন ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক। মা লক্ষ্মী হলেন ধনশক্তির বা বৈশ্য শক্তির প্রতীক এবং গণপতি গণেশ হচ্ছেন জনগণের বা শূদ্র শক্তির প্রতীক। মাতা দুর্গাসহ তাঁর এই সমগ্র পরিবার— সমগ্র হিন্দু সমাজের বাস্তব রূপ। সর্বোপরি মাথার উপর দেবাদিদেব মহাদেব আশীর্বাদ করছেন।'' এভাবেই সঙ্ঘনেতা আচার্যদেব হিন্দুজাতির প্রতীক রূপে মাতৃমূর্তির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, সমগ্র হিন্দু জনগণের মিলন ও সঙ্ঘবদ্ধতাই মায়ের কাম্য। হিন্দু সমাজের তথা জনগণের ঐক্য, মিলন ও সঙ্ঘবদ্ধতাই শ্রীশ্রীমায়ের আসল পূজা। আচার্যদেব বলেছেন— ভারতবর্ষে বর্তমানে যত সমস্যা আছে, তার সমস্ত সমাধান হচ্ছে হিন্দু সংগঠন। সমগ্র হিন্দুসমাজ সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হলে ভারতের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এইরূপে জাতি গঠনের জন্যই আচার্যদেব এযুগে নবভাবে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার প্রবর্তন করেছিলেন।

সঙ্ঘনেতা আচার্যদেব এভাবে শ্রীশ্রীমায়ের পূজার যে পথ ও আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, তা অনুসরণ করতে পারলে সমগ্র হিন্দুজাতি তথা ভারতের মহাকল্যাণ সাধিত হবে।

গৌরী মা

সবুজকলি সেন

উনবিংশ শতকে হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলনের মধ্য গগনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজের কার্য সাধনের জন্য এবং বাঙালি তথা সর্বমানবের ধর্মজীবনে সংস্কার সাধনের জন্য নির্বাচন করেছিলেন কয়েকজন শুদ্ধসত্ত্ব সিদ্ধ মানবকে, তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন নারী। একজন তাঁরই শক্তি, বিবাহিতা পত্নী সারদা দেবী, অপরজন তাঁর কন্যা শিষ্যা গৌরী মা।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এই দুই বাঙালি নারী ধর্মের ইতিহাসে ও বাঙালি সমাজে বিপ্লব আনেন। প্রজ্ঞা, সজ্ঞা ও মুক্ত চিন্তায় এই দুই নারী নীরবে সমাজের ইতিহাসে যে অবদান রেখেছেন, তার যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। সারদাদেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন তাক্ষর আপন কর্মে ভার এবং গৌরীমাকে দিয়েছিলেন নারী সমাজের উন্নয়নের ভার। সারদাদেবী (১৮৫৩) এবং গৌরী মা (১৮৫৭) প্রায় সমবয়স্কা। তাঁদের সম্পর্ক ছিল একাধারে সখী, মাতা ও কন্যা। গুরুর ইচ্ছা পূরণ করে প্রথম বাংলায় হিন্দু নারীদের জন্য আশ্রম স্থাপন করেন গৌরী মা। লক্ষ্য ছিল বাঙালি মেয়েদের স্বয়ম্ভর করা। গৌরী মা যেন বিবেকানন্দের মহিলা রূপ। বৈচিত্র্যময় কর্মমুখর তাঁর জীবন বিবেকানন্দের মতোই নির্ভীক। তাঁরই মতো একাকী পরিব্রাজন করেছেন সমগ্র ভারত। সন্ন্যাসীর বেশে দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী এক নারী। অপরদিকে সারদাদেবী রক্ষণশীল বাঙালি বধূর সব চিহ্নগুলিকে বজায় রেখে নম্রতা, ধীরতা ও লজ্জাকে বিসর্জন না দিয়েও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারিণী।

আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে ভবানীপুরের একটি প্রাঙ্গণে কয়েকটি বালক-বালিকা খেলা করছিল। সামনের রাস্তা দিয়ে একজন পথিককে দেখে তাদের মধ্যে একটি বালিকা তাঁর কাছে ছুটে যায়। পথিকের বৈশিষ্ট্য তাকে আকর্ষণ করে। পথিক সেই বালিকাকে দু-চারটি কথার পর, 'তোমার কৃষ্ণভক্তি হোক' বলে চলে যান। এই ঘটনার কয়েকদিন পর সেই মেয়েটি তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে বরানগরে আত্মীয়বাড়ি যায়। মেয়েটি কিন্তু সাধারণ মেয়ে ছিল না। তাই বরানগরে সকলের অজ্ঞাতসারে কী এক আকর্ষণে সে কাছেই নিমতেঘোলার কলাবাগানে একটি সাধন কুটির দেখে প্রবেশ করে। মেয়েটি দেখে, ধ্যানাসনে উপবিষ্ট চক্ষুমুদ্রিত দেহ নিস্পন্দ সেই আগের দেখা পথের পথিক। মেয়েটি পথিককে প্রণাম করে ও তার মনোবাসনা জানায়। সাধুপুরুষ বাগানের পাশের একটি বাড়িতে সেই মেয়েটির রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেন এবং পরেরদিন রাসপূর্ণিমা তিথিতে তাঁকে দীক্ষা দেন। সেই মেয়েটির আত্মীয়স্বজন ও বড় ভাই অনেক অনুসন্ধানের পর ঐ বাগানে তাঁদের সাক্ষাৎ পায়। সাধুপুরুষটি আত্মীয়দের শান্ত করে বলেন, 'দেখ বাবা ও ছেলেমানুষ, ওকে যেন কেউ বোকো না, হলদেপাখি ধরে রাখা দায়।' মেয়েটিকে বলেন, 'যাও মা এখন, আবার দেখা হবে— গঙ্গা তীরে।'

এই হলদেপাখি গৌরী মা। সংসার জীবনে নাম ছিল মৃড়ানী। ১২৬৪ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮৫৭ সালে কলকাতার ভবানীপুরের এক বনেদি পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কলকাতায় তখন নারীশিক্ষার প্রচলন হয়েছে। অভিজাত বনেদি বাড়ির অনেক মহিলাই তখন শুধু

'খাওয়ার পরে রাঁধা আর রাঁধার পরে খাওয়ার' বাইরের জগতের স্বাদ পেয়েছেন। পড়াশুনো মেয়েদের অন্য একটি জগৎ খুলে দিয়েছে। মৃড়ানীর মা গিরিবালা যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল এবং পার্সী ও ইংরেজিও তিনি কিছু কিছু জানতেন। সঙ্গীত ও সঙ্গীত রচনাতে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তাঁর রচিত 'নামগান' এবং 'বৈরাগ্য সঙ্গীতমালা' পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। গিরিবালাও ছিলেন এক সাধিকা, উপরন্তু ধনী মাতামহের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়ায় তাঁকে কারো মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে সদর্থে তেজস্বিতা আনে তা গিরিবালার ছিল। এই পরিবারে জন্ম হবার জন্যই মৃড়ানীকে সেই দারিদ্র ও অশিক্ষা দেখতে হয়নি, যা সারদাদেবীকে দেখতে হয়েছিল।

স্যার জন লরেন্স যখন ভারতবর্ষের শাসনকর্তা তখন ১৮৬৮ সালে কলকাতার ভবানীপুরে বিশপ রবার্ট মিলম্যান এবং তাঁর বোন ফ্রান্সিস মোরিয়া মিলম্যানের চেষ্টায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচাপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও দ্বারকানাথ মিত্র এবং জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। এর প্রধান শিক্ষায়িত্রী ছিলেন মিস হারফোর্ড। মৃড়ানী এই বিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়েন এবং ভাল ছাত্রী বলে পরিচিত হন। আবাল্য তেজস্বী মৃড়ানীর কিছুদিনের মধ্যেই মিশনারিদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে মতানৈক্য হয় এবং মৃড়ানী বিদ্যালয় ছেড়ে এসে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে একটি পাঠশালা খোলেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সাহসী জীবনের সম্ভাবনা তাঁর বালিকা বয়সেই দেখা গিয়েছিল। যে কাজ কোনো বাঙালি পুরুষ করতে সাহসী ও উদ্যোগী হতেন না নির্ভীক তেজস্বী মৃড়ানী সেই কাজে অগ্রসর হতেন সর্বদাই, এই বালিকা বয়স থেকেই মৃড়ানীর প্রবল ধর্মানুরাগ দেখা যায়। তাঁর মা ধর্মানুরাগী হওয়ায় বাড়িতে সাধু সন্ন্যাসীর আসা-যাওয়া হত। এক ব্রজরমণী একবার মৃড়ানীদের ভবানীপুরের বাড়িতে আসেন, সঙ্গে ছিল একটি সুদর্শন নারায়ণ শিলা। কোনো এক অলৌকিক অনুভূতিতে ইনি জেনেছিলেন এই নারায়ণ মৃড়ানীর প্রেমে মজেছেন। ব্রজরমণী সেই নারায়ণ শিলাটিকে বাবার আগে মৃড়ানীকে দিয়ে যান।

এই শিলাই মৃড়ানীর পরবর্তীকালের গৌরী মা 'দামোদর শিলা' তাঁর পতি, সখা, বান্ধব।

মৃড়ানীর প্রবল ধর্মভাব ও অনাসক্তি দেখে তাঁর বাড়িতে সেকালের প্রথানুযায়ী বিবাহের চিন্তা শুরু হল। আত্মীয়-স্বজন ভাবলেন, সংসারের বন্ধন এই বৈরাগ্যকে কাটাতে পারে। মৃড়ানী স্পষ্ট জানালেন, 'তেমন বরকে বিয়ে করব যে কখনো মরে না।' অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া আর কাউকেই তিনি পতিরূপে মেনে নেবেন না। বিবাহ করার সিদ্ধান্ত কোনো কিশোরী একা নেবে এ কখনো কোনো পরিবার মেনে নিত না এবং এখনও কোনো পরিবার মেনে নেয় না। মৃড়ানীর মা গিরিবালা কন্যার মতের বিরুদ্ধে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। পিতা ছিলেন নিরাসক্ত। কিন্তু পরিবারের অন্যরা তাঁর বিয়ে দেওয়াই স্থির করলেন। সে বিয়ের রাতেই মৃড়ানী তাঁর অসাধারণ মায়ের সাহায্যে পালিয়ে গেলেন এক আত্মীয়ার বাড়ি। কয়েকদিন পরে খবর পেয়ে আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনা হল এবং রাখা হল নজরবন্দী করে। একাধিকবার পলায়নের চেষ্টা করেন তিনি, শেষে একবার সুযোগ এল। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে গঙ্গাসাগর তীর্থে গেলেন মৃড়ানী। সেখানে সকলের অলক্ষ্যে ঐ ভিড়ের সুযোগে হলদেপাখী উড়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ১৮, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, অসাধারণ সুন্দরী। আত্মীয়-স্বজনরা সাগরতীর কোতোয়ালের ঘাঁটি ঘুরে যখন কোথাও তাঁর সন্ধান পেলেন না, তখন হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন গৃহে। এরপর মৃড়ানীর যাত্রা শুরু। এ এক আশ্চর্য অভিযান। দুর্গম পথযাত্রা— একাকী তরুণী মৃড়ানী। রোমহর্ষক উপন্যাসের মতই আকর্ষক এই যাত্রা। যাত্রাপথটি লক্ষ্য করা যাক।

''আত্মীয়গণের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া মৃড়ানী গঙ্গাসাগরেই অদূরবর্তী একটি ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন— যখন তিনি বুঝিলেন সঙ্গীরা সকলেই দেশে চলিয়া গিয়াছেন, তখন ঝোপঝাড় হইতে বাহির হইয়া সাধু-সন্ন্যাসীগণের নিকট ভারতবর্ষের নানা তীর্থের সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাসাগর হইতে তিনি একদল উত্তর-পশ্চিম দেশীয় সাধুর সহিত হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহাদের দলে কয়েকজন সন্ন্যাসিনীও ছিলেন। এরূপ যোগাযোগে তিনি খুবই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলেন'' (গৌরী মা, শ্রী দুর্গাপুরী দেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, পৃঃ ৪৬)।

সুন্দরী মৃড়ানীর গৌরবর্ণের জন্য তীর্থ পর্যটনের সময় পাহাড়ীরা এবং উত্তর-পশ্চিম দেশের মানুষেরা 'গৌরমাঈ' বলে ডাকত। আমরাও এরপর থেকে তাঁকে তাঁর পরবর্তী জীবনের নাম গৌরীমা বলেই উল্লেখ করব। পরিব্রাজনের সময় গৌরীমা মনন সন্ন্যাস নিয়ে গৈরিক বসন পরিধান আরম্ভ করেন। তরুণী গৌরীমা নিজের রূপ ঢেকে রাখবার জন্য কখনো মাথার চুল কেটে ফেলতেন, কখনও গায়ে কাদা ভস্ম মেখে থাকতেন, কখনও বা পাগলের বেশে আবার কখনও বা আলখাল্লায় পুরুষের বেশে থাকতেন। গলায় ঝোলানো থাকত দামোদর শিলা, কয়েকটি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামান্য জিনিসপত্র। প্রয়োজন ছাড়া তিনি মৌন অবলম্বন করতেন। এভাবে একা সকল বন্ধনমুক্ত গৌরীমা হৃষিকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, পাঞ্জাবের জ্বালামুখী, কাশ্মীরের অমরনাথ ভ্রমণ করেন। আজ একবিংশ শতাব্দীতে চিন্তা করাও সম্ভব নয় কীভাবে প্রায় ১৫০ বছর আগে এক বাঙালি তরুণী সন্ন্যাসিনী আত্মীয়-স্বজন বিহীন অবস্থায় পায়ে হেঁটে দুর্গম পার্বত্য অরণ্য পরিক্রমা করেছেন সেই পরমের সন্ধানে। ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছেন হিমালয়ের কোলে। কখনো সঙ্গী পেয়েছেন, কখনো বা নিঃসঙ্গ হয়ে সেই পাহাড়ে

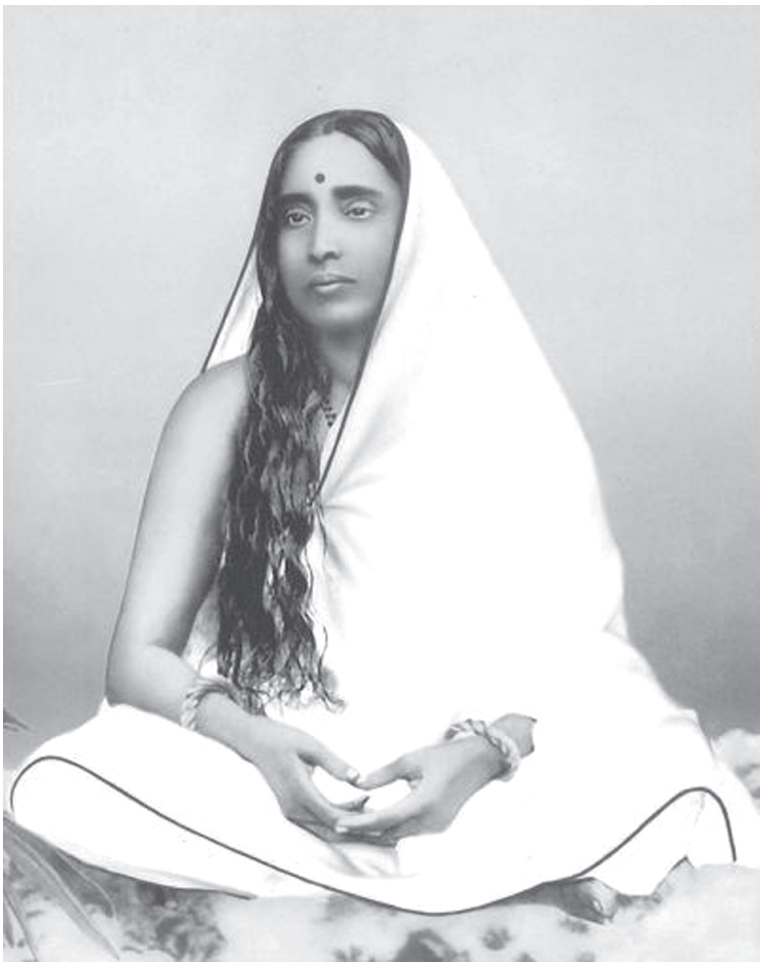

জঙ্গলে ঘুরে সন্ধান করেছেন ঈপ্সিতের। একাধিকবার প্রাণ সংশয় হয়েছিল তাঁর, তবু কোনো কিছুই তাঁকে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি, ভীত করতে পারেনি। শুধু হিমালয় বা পাঞ্জাব নয়, বৃন্দাবন থেকে দ্বারকা তিনি ভ্রমণ করেন একাই। কয়েক বছর পর গৌরীমা ফিরে আসেন কলকাতায়। হলদেপাখির আর কোনো ভয় ছিল না বন্ধনের। বাড়ি থেকে তিনি যান শ্রীক্ষেত্র পুরী। পুরী থেকে ফিরে তাঁর জীবনে আসে আর একটি বিশেষ মুহূর্ত। উত্তর কলকাতার ভক্ত জমিদার রাধামোহন বসু এবং তার পুত্র বলরাম বসুর সঙ্গে গৌরীমা-র আগের থেকেই পরিচয় ছিল। গৌরীমা প্রায়ই বসু ভবনে থাকতেন। বলরাম বসু দক্ষিণেশ্বরে যেতেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে— তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত। বলরাম বসুর আগ্রহে এক অলৌকিক ঘটনার টানে একদিন গৌরীমা দক্ষিণেশ্বরে মহাপুরুষ দর্শনে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন মাত্রই পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে তাঁর। দেখেন বালিকা অবস্থায় যাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন সেই নিমতে ঘোলার কলাবাগানের সাধু— তাঁর দীক্ষাগুরু তাঁর সামনে। দীক্ষালাভের দীর্ঘকাল পরে আবার গঙ্গাতীরে দেখা হলে গুরু-শিষ্যা, পিতা-কন্যার। এখন গৌরীমার বয়স ২৫। শ্রীরামকৃষ্ণ-জায়া সারদাদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে নহবতে বাস করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরীমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ওগো ব্রহ্মময়ী একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন সঙ্গিনী এল।' (ঐ, পৃঃ ৯৫)।

গৌরীমাও দক্ষিণেশ্বরে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সারদাও সঙ্গিনী তথা কন্যা পেয়ে আনন্দিত হন। গৌরীমার দক্ষিণেশ্বরে বাস করার সময় একদিন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যার হাতে গৈরিক বস্ত্র দেন। সন্ন্যাসের অন্য বিধি ব্যবস্থা গুরুর উপদেশ মতো শিষ্যা সম্পন্ন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যার নাম দিয়েছিলেন 'গৌরী-আনন্দ'। গৌরীমা নিজেকে বলতেন গৌরের দাসীর দাসী— সেইভাবেই তার আনন্দ। নিজেকে তিনি 'গৌরদাসী' বলে গর্ব অনুভব করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যাকে ডাকতেন গৌরী নামে। সারদাদেবীর স্নেহের ডাক ছিল গৌরদাসী। স্বামী বিবেকানন্দ ডাকতেন গৌরমা বলে। আপামর ভক্ত তাঁকে বলতেন গৌরমা অথবা গৌরীমা।

দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসের একটি নতুন আদর্শ তাঁর অন্তরঙ্গ দুজনকে প্রচার এবং প্রয়োগ করার জন্য দিয়ে যান। এই আদর্শটি হল শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ। হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আগে কেউ এই চিন্তা করেছেন বলে জানা যায় না। যে দুটি আধার তিনি নির্বাচন করেছিলেন— তাঁরা হলেন নরেন্দ্রনাথ ও গৌরীমা। গৌরীমার দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে গৌরীমার হৃদয়ে সেবাধর্মের প্রেরণা জাগাতে লাগলেন। এবার তাঁর লক্ষ্য বাংলার নারীকুল— হিন্দু সমাজের নারীরা। তাদের চৈতন্য জাগরণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরীমাকে আদেশ দিয়েছিলেন। তেজস্বিনী, সাহসী গৌরীমা প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে বাগবাজার বসুভবনে (বর্তমান বলরাম মন্দির) গিয়ে অন্দরমহলে মহিলাদের কাছে ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন। আবার কখনো তাঁর নির্দেশ হত যদুমল্লিকের বাড়ির অন্দরমহলে যাওয়া। একদিন ব্রাহ্মভক্ত মণি মল্লিকের বাগানে ব্রাহ্ম মহিলাদের কাছে পাঠালেন তত্ত্ব আলোচনার জন্য। সেখানে নিরাকার তত্ত্বের আলোচনা চলছিল। গৌরীমাও করলেন সাকারবাদ ও অবতারবাদের আলোচনা। এইভাবেই গুরু শিষ্যাকে প্রস্তুত করেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে তখন সবে ভোর হচ্ছে সেই ঊষাকালে একদিন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যা-কন্যা গৌরীমাকে বললেন, 'দেখ গৌরী, আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্‌কা' (ঐ, ১১২)। গৌরীমা তখন পূজার ফুল তোলায় ব্যস্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ রহস্যপূর্ণ কথা বুঝতে

না পেরে বলেছিলেন, 'এখানে কাদা কোথায় যে চটকাবো, সবই যে কাঁকর।' শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন, এদেশের মায়েদের বড় দুঃখ, গৌরীমাকে কাজ করতে হবে তাঁদের মধ্যে। এবং সে কাজ হিমালয়ে বসে ধ্যান করে হবে না, পাহাড়ে কেবলমাত্র কয়েকজন মেয়েকে তৈরি করেও নয়। এই কলকাতায় বসেই কাজ করতে হবে গৌরীমাকে। যেমন আদেশ দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে স্ত্রী সারদাদেবীকে কলকাতার লোকদের দেখতে এবং তাদের জন্য ভাবতে। শিষ্যা কন্যাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন গুরু— সাধন ভজন অনেক হয়েছে, এবার তপস্যাপূত সেই জীবন দিতে হবে মানুষের সেবায়। গৌরীমার 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী' আশ্রমের এই সূচনা। সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে একটু সময় লেগেছিল। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ থাকলেও প্রথমদিকে তিনি অতটা উৎসাহবোধ করেননি। আকৈশোর সংসারের বাইরে থাকা একাকী পরিব্রাজনরতা সাধিকার সংসারের কলকোলাহল বিষবৎ মনে হত। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের আগের থেকেই এবং তিরোধানের পরেও কয়েক বছর তীর্থ পর্যটনে অতিবাহিত করেন। কিন্তু দীর্ঘ পর্যটনকালে ভারতের নারী জাতির দুঃখ দুর্দশা তিনি এক নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন।

নারীদের প্রতি তিনি সমবেদনা অনুভব করলেন। কলকাতার যে নারীরা শিক্ষার আলোক পেয়েছেন তাঁদের তুলনায় সারা ভারতে, যাঁরা পাননি তাঁদের সংখ্যা লক্ষগুণ বেশি ছিল। তিনি দেখতে পেলেন অজ্ঞতা, অশিক্ষা নারীর জীবনকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। তিনি বুঝলেন নারীর ব্যথা নারীকেই দূর করতে হবে। গুরুর যে আদেশবাণী বীজ আকারে প্রচ্ছন্ন ছিল সেটিই ধীরে ধীরে শাখা পল্লব বিস্তার করতে লাগল। অবশেষে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে তিনি কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে গুরুপত্নী সারদাদেবী নামে 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। আজ একবিংশ শতাব্দীতে কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, আজ থেকে ১১৫ বছর আগে যখন গৌরীমা ব্যারাকপুরের গঙ্গাতীরে মেয়েদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন সমাজে নারীর অবস্থা এবং নারীশিক্ষার ইতিহাস কেমন ছিল। মেয়েরা ভুলেই গিয়েছিলেন যে ঘরের কাজ ছাড়াও তাদের অন্য কর্তব্য আছে, এবং ভুলেই গিয়েছিলেন যে নারীদেরও আত্মার জাগরণের প্রয়োজন আছে। গৌরীমা একা কপর্দকহীন অবস্থায় সমাজের প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে এই আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। আজ নারী আন্দোলনের ইতিহাসে গৌরীমার এই আত্মত্যাগ ও অবদান কোথাও লেখা হয় না। বোধহয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বলেই ইতিহাসবিদদের এত অনীহা। গৌরীমা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থভিক্ষা ও মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে আশ্রম পরিচালনা করতেন। তিনি নিজে বাজার করতেন এবং রান্না করে ছাত্রীদের খাওয়াতেন আবার স্বয়ং বাড়ি বাড়ি গিয়ে বয়স্কা ছাত্রীদের নিয়ে আসতেন। এই আশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল (১) হিন্দুধর্ম এবং সমাজের আদর্শ অনুযায়ী স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, (২) সৎ বংশজাত দুঃস্থ বালিকা ও মহিলাদের আশ্রয় দান এবং (৩) আদর্শ জীবন যাত্রার পথে নারীদের সহায়তা করা।

গৌরীমার সেই ক্ষুদ্র আশ্রমে প্রথমে প্রায় ২০-২৫ জন কুমারী ও মহিলা আশ্রমবাসিনী হয়েছিলেন। এই অবিবাহিতা কুমারীদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রহ্মচারিণী জীবন ও সন্ন্যাসীজীবন গ্রহণ করেন। এঁদের নিয়েই গৌরীমা 'মাতৃসঙ্ঘ' গঠন করেন।

কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিক্ষাদান, আশ্রমে বালিকা ও বিধবাদের আশ্রয় দান এবং কয়েকজনকে ব্রহ্মচর্য ও শিক্ষাদনই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নারীজাতিকে আদর্শ জীবনযাত্রার পথে সহায়তা দেওয়া এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধন করা। আশ্রমের বাইরেও অনেক দুঃস্থ নারীকে তিনি সাহায্য করতেন। গৌরীমার প্রথম জীবনের ইতিহাসে যেমন তার নির্ভীকতার পরিচয় দেয়, তাঁর তেজস্বী স্বভাবের পরিচয় দেয়। পরিণত বয়সেও তাঁর এই সাহসিকতা এবং পরদুঃখকাতরতা আমাদের তেমনই মুগ্ধ করে। গৌরীমার জীবনের দু-একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়।

একদিন সকালে গৌরীমা গঙ্গাস্নান করতে গেছেন, সঙ্গে আশ্রমের কয়েকটি বালিকা। গঙ্গার ঘাটে এসে তিনি দেখতে পেলেন কতগুলি লোক ঘাটে জড়ো হয়ে 'হায় হায়' করছে। তিনি গঙ্গার দিকে চেয়ে দেখতে পেলেন জলে একটি মেয়ে ডুবে যাচ্ছে। সেটি দেখে ব্যাপারটি বুঝে তিনি দর্শকমণ্ডলীকে তিরস্কার করলেন তামাশা দেখার জন্য এবং তৎক্ষণাৎ অঞ্চলটি কোমরে জড়িয়ে জলে ঝাঁপ দিলেন। আবেগে তিনি ভুলেই গেলেন যে, তিনি সাঁতার জানেন না। আশ্রমের বালিকারা চিৎকার করে উঠলে, দু-তিন জন পুরুষ লজ্জিত হয়ে সাঁতার কেটে সেই মেয়েটিকে তুলে আনলেন। পরে জানা গেল, মেয়েটি মৃগী রোগগ্রস্ত ছিল। গৌরীমা তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে তাঁর আশ্রম ব্যারাকপুর থেকে কলকাতায় উঠে আসে, গৌরীমার বিশেষ ইচ্ছে ছিল সারদাদেবীর বাগবাজার বাড়ির কাছাকাছি তাঁর কর্মক্ষেত্র করার। প্রথমে গোয়াবাগান লেনের একটি ভাড়াটে বাড়িতে আশ্রমের কাজ আরম্ভ হয় পরে গৌরীমার অনেক চেষ্টায় এবং তাঁর গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদের সাহায্যে উত্তর কলকাতায় ২৬ নং মহারাণী হেমন্ত কুমারী স্ট্রীটে বর্তমান আশ্রম গড়ে ওঠে। ১৩৩১ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ প্রিয় 'দামোদর'কে নিয়ে গৌরীমা ভবনে প্রবেশ করেন। অসমের গৌরীপুরের রাণী সরোজবালার দানে এই আশ্রমভবনের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। আজও আশ্রম সেখানে আছে। এই আশ্রমে সারদাদেবী একাধিকবার এসেছেন।

গৌরীমার প্রেম শুধু যে মানুষের উপর ছিল তা নয়, পশুপাখির উপরেও ছিল। একবার আশ্রম যখন শ্যামবাজার স্ট্রীটে তখন একদিন দু-তিনটি হনুমান একটি কুকুর শাবককে ছাদের

উপর তুলে পীড়ন করতে থাকে। বিপন্ন কুকুর শাবককে কি করে হনুমানের কবল থেকে উদ্ধার করা যায়— তিনি সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই বাড়িতে ছাদে ওঠার কোনো সিঁড়ি ছিল না। পরিণতবয়স্কা গৌরীমা কোমরে লাঠি গুঁজে একটি জীর্ণ পিচ্ছিল প্রাচীর বেয়ে ছাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। হনুমানগুলো বিকৃত মুখ করে তাঁকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল, তখন তিনি এক জায়গায় বসে লাঠিটি বার করে হনুমানের সামনে ঘোরাতে লাগলেন। হনুমানগুলি ভয়ে সরে গেল। তিনি ছাদের উপর উঠে কাপড়ে বেঁধে আবার নেমে এলেন। তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আশ্রমবাসিনীরা তাঁকে বললেন, 'একটা কুকুরছানার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন মা, ভাগ্যিস পড়ে যাননি তাহলে কি হত।' গৌরীমা বলেছিলেন, 'ভগবানের সৃষ্ট একটি অসহায় জীব এভাবে চোখের সামনে মরবে, সেটা কি ভাল হত!' (গৌরীমা, শ্রীদুর্গাপুরীদেবী শ্রীশ্রীসারদাদেশ্বরী আশ্রম, পৃঃ ৩৩)।

গৌরীমা ছিলেন সংস্কারমুক্ত উদার চিন্তার অধিকারিণী। পাপকে ত্যাগ করলে পাপীকে করেছেন করুণা। তাঁর গুরুপত্নী সারদাদেবীর মতোই তিনি অতীতে বিপথগামীকেও গ্রহণ করেছিলেন পরম আদরে। ত্রিবেণীর তীরে একদিন গৌরীমা ধ্যানমগ্ন ছিলেন। একজন মহিলা একা এই সন্ন্যাসিনীকে দেখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই স্থানে গিয়ে বসলেন। ধ্যান স্তব পর্বের শেষে গৌরীমা দেখেন এক সুন্দরী নারী, তাঁর চোখে বইছে অশ্রুধারা। গৌরীমার জিজ্ঞাসায় সেই নারী তাঁর বিপথগামিতা এবং ক্ষণিকের ভুলে যে সর্বনাশ হয়েছে তা অকপটে জানান এবং গৌরীমার কাছে শান্তির উপায় চান। গৌরীমার উপদেশে তিনি যমুনার জলে তার সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার বিসর্জন দিলেন, কেশরাশি কেটে ফেললেন এবং দীনহীনার বেশ ধারণ করে ঋষিকেশে লোকালয়ের বাইরে সাধন ভজনে নিমগ্ন থাকলেন। সেই নারী পরবর্তী জীবনে সাধনার ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করেছিলেন জানা যায়। (গৌরীমাতা, শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম, শ্রী দুর্গাপুরী দেবীমা, পৃঃ ৩৪)।

সাধন ভজনে দিবারাত্রি মগ্ন থাকলেও সরল আনন্দে গৌরীমার আগ্রহ ছিল গুরুপত্নী সারদাদেবীর মতই। গৌরীমা ছিলেন আনন্দদায়িনী। সারদাদেবীকে এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনিয়ে যেমন আনন্দ দিতেন, তেমনি সারদাদেবীর সঙ্গে কৌতুক পরিহাসও করতেন। প্রব্রজ্যাকালে তিনি যেমন পুরুষ সাধুবেশে থাকতেন সারদাদেবী সেটি একবার দেখতে চান। এক সন্ধ্যায় জয়রামবাটীতে গৌরীমা একজন সঙ্গী নিয়ে পুরুষের বেশে সারদাদেবীর কাছে যান। অন্দরমহলে সন্ধ্যায় একজন পুরুষ প্রবেশ করাতে শ্রীমায়ের আত্মীয়েরা ভয় পেয়ে যান। সারদাদেবী অবশেষে গৌরীমাকে চিনতে পারেন এবং পরিহাসের মধ্যে ব্যাপারটি শেষ হয়। গৌরীমার চরিত্রের দৃঢ়তা এবং মানুষ চেনার ক্ষমতা কয়েকটি ঘটনায় বোঝা যায়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, গৌরীমার একক চেষ্টায় সারদেশ্বরী আশ্রমের সূচনা হয়েছিল। দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে গৌরীমাকে সেই আশ্রম পরিচালনা করতে হয়। এমন সময় আশ্রমের পরিচালন সমিতির কোনো একজন সদস্য গৌরীমাকে এসে জানান যে, তাঁর পরিচিত এক ধনীব্যক্তি পিতার স্মৃতি রক্ষায় কয়েক হাজার টাকা আশ্রমে দান করতে ইচ্ছুক। এই কথা শুনে গৌরীমা সেই সদস্যকে লোকটি সম্বন্ধে আরও কিছু খোঁজখবর নিতে বলেন। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, ঐ ব্যক্তি তার বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বঞ্চনা করে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে। সেকথা শুনে গৌরীমা বলেন, 'এই বঞ্চনার টাকা আমি নিতে পারব না। তুমি গিয়ে তাকে বল, আশ্রমের ভাগের টাকাটা যেন সেই বিধবাকে ফিরিয়ে দেন। তাতেই আশ্রমের সেবা হবে ও তারও কল্যাণ হবে।' (ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮)। এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি গৌরীমাকে আরও একবার অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছিল। ১৩৩১ সালে কলকাতা ইন্সটিটিউটে জাস্টিস স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে আশ্রম সম্পর্কে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আশ্রমের বাড়ি নির্মাণের জন্য তখন অনেক হাজার টাকা ঋণ হয়েছিল গৌরীমার। সেই সভায় একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলেন যে, তাঁর অনুগত এক ধনী ব্যক্তির কাছে আশ্রমের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার দান পাওয়া যাবে। এই সম্ভাবনাতে উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, কেননা এই দান পেলে সবরকম ঋণ শোধ করেও ২৫-৩০ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। এই সংবাদটি তাঁরা গৌরীমাকে আনন্দের সঙ্গে জানালেন। গৌরীমা এই সংবাদে কোনো আনন্দ প্রকাশ না করে বললেন, 'টাকাও অনেক, আশ্রমের অভাবও অনেক। কিন্তু বাবা আমার মনটায় খটকা লাগছে, কিছু গোলমাল আছে। দাতার বিষয়ে ভাল করে জেনে দেখ তো।' কয়েকদিন পর দাতার নাম এবং কি উপায়ে তিনি অর্থ উপার্জন করেন সেটি জেনে গৌরীমা বলেছিলেন, ৫০ লক্ষ টাকা হলেও এ ধরনের কোনো দান তিনি গ্রহণ করবেন না। আশ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত ভদ্রলোকেরা অনেকেই এতে অসন্তুষ্ট হলেন, অনেকেই বিস্মিত বোধ করলেন, কিন্তু নির্লোভ সন্ন্যাসিনী অনায়াসে এই অর্থ ত্যাগ করলেন।

তেজস্বিনী গৌরীমার সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তাঁর আশ্রম পরিচালনার অন্য বিষয়গুলিতেও দেখা যায়। যেমন, কোনো ছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে উপরের শ্রেণীতে তুলে না দেওয়া হলে, কোনো বালিকাকে আশ্রমে ভর্তি করা সম্ভব না হলে আবার আশ্রম পরিচালনায় কর্তৃত্ব করতে না পেরে অনেকেই গৌরীমার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তর্ক করেছেন। কিন্তু তিনি কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি এবং মিথ্যা ও আদর্শহীনতার সঙ্গে জীবনে কোনোদিন আপোস করেননি।

তেজস্বিনী এই নারীকে স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের থেকে গৌরীমা কয়েক বছরের বড় ছিলেন এবং গৌরীমা স্বামীজীকে সন্তানবৎ স্নেহ করতেন। গৌরীমার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সংগঠন শক্তির বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলেন। তাই যখন প্রথম নারীমঠের পরিকল্পনা তিনি করেন, তখন ইংল্যান্ড থেকে গুরুভ্রাতাদের চিঠিতে লিখেছিলেন গৌরীমাকে সেই আশ্রমের মহান্ত করতে। আর একটি পর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছেন, 'গৌরীমা কোথায়? এক হাজার গৌরমার দরকার— noble stirring spirit (গৌরীমাতা, ৩৯)। নারীমঠ প্রতিষ্ঠা করে সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে গৌরীমা গোলাপমাদের সঙ্গে নিয়ে একটি আলোড়ন তুলে দিন সমাজে সেটি স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল।

গৌরীমার তেজস্বিতার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তবুও একটি ঘটনার উল্লেখ করলে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। নারীজাতির প্রতি অন্যায় অবিচার দেখলে তিনি কিছুতেই নীরব থাকতে পারতেন না। তাঁর বিবেক সিংহবিক্রমে জেগে উঠত। প্রতিকার না করা পর্যন্ত তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। একদিন রাত্রি প্রায় ১০টার সময় গৌরীমা আশ্রমবাসিনীদের কাছে পুরাণের গল্পে বলছিলেন। কাছেই একটি বাড়ি থেকে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল। নিশ্চয়ই কেউ বিপদে পড়েছে তাঁকে উদ্ধার করতে হবে মনে করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আশ্রমবাসিনীরা আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে অতরাত্রে পরের বাড়িতে অযাচিত ভাবে প্রবেশ করে তাদের পারিবারিক কলহের মধ্যে গিয়ে তিনি নিজেই বিপন্ন হবেন। গৌরীমা কোনো যুক্তিতেই কর্ণপাত না করে আশ্রমবাসিনীদের আশ্বস্ত করে একটি লাঠি হাতে একাকী বেরিয়ে গেলেন। রাত্রি ১টার পর দেখা গেল গৌরীমা একটি ঘোমটায় মুখ ঢাকা তরুণী বধূর হাত ধরে রাস্তা দিয়ে আসছেন, তাঁদের অনুসরণ করছেন একজন পুরুষ এবং গৌরীমা তাঁকে প্রবল ভর্ৎসনা করে যাচ্ছেন। আশ্রমবাসিনীরা লক্ষ্য করলেন যে, আশ্রমে না এসে গৌরীমা তাঁদের নিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন। রাত্রি ৩টায় গৌরীমা আবার আশ্রমে ফিরে এলেন। ঘটনাটি ছিল বধূ নির্যাতনের।

কৌশলে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে বাড়ির কর্তৃপক্ষকে আইন আদালতের ভয় দেখিয়ে সেই নিগৃহীতা বধূকে উদ্ধার করেন তিনি এবং পুলিশের সাহায্যে তাঁকে পিত্রালয়ে রেখে আসেন। পরে তাঁর মধ্যস্থতায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ক্ষমা প্রার্থনা করে বধূকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান। এরপরে মাঝে মাঝেই গৌরীমা তাঁদের বাড়ি গিয়ে খবর নিয়ে আসতেন বধূটির উপর আবার অত্যাচার হচ্ছে কিনা। এ কাজ করার জন্য গৌরীমাকে সরকারের কোনো আইনের সাহায্য নিতে হয়নি, কোনো আন্দোলন করতে হয়নি। অসীম সাহস, করুণা এবং তেজস্বিতায় তিনি বহুবার এধরনের দুঃসাহসী কাজ করেছেন। সারদাদেবী সেই তেজ দেখে বলতেন, 'গৌরীদাসী কি মেয়ে? ও তো পুরুষ। ওর মত কটা পুরুষ আছে?' (গৌরীমা। শ্রী দুর্গাপুরী দেবী, পৃঃ ১৯২)

স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত 'মাতৃদ্বয়' পুস্তিকায় লিখেছেন, 'গৌরীমার মনস্তত্ত্ব বলিতে হইলে, এই বলিতে হয় যে, তিনি অন্তরে পুরুষ, বাহিরে প্রকৃতি, অর্থাৎ চণ্ডীতে যাঁহাতে ('চিত্তে কৃপা সমরানিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা') ভয়ঙ্করী ও ক্ষেমঙ্করী, রুদ্রাণী ও মৃড়ানী বলা হয়। গৌরীমার ভিতর এই বিপরীত ধারার সম্মিলন তিরোধানও আশ্চর্যভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর সম্মুখে যাইলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইত যে, প্রত্যক্ষ মহাশক্তির কাছে ক্ষুদ্র জীব গিয়াছে। যেমন গম্ভীর, রাশভারী, প্রত্যক্ষ রুদ্রাণীর মূর্তি, আবার অপর দিকে তেমন স্নেহময়ী মাতা। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রথম হইতে এই বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য গৌরীমাকে অতীব উচ্চস্থান দিতেন। চণ্ডীতে আদ্যাশক্তি যাহাকে বলে, তাহা গৌরীমাকে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইত।' (ঐ, পাতা ৩৭)

এই নারী ধর্মজীবন ও সমাজজীবনে সকলের অলক্ষ্যে যে অবদান রেখে গেছেন এবং নীরবে যে নারী জাগরণের সূচনা করে গেছেন, তার যথার্থ মূল্যায়ন আমাদের দায়বদ্ধতা। সর্ব অর্থেই ধর্মজগতের এই নারী শাশ্বত আধুনিকা মর্যাদা লাভের যোগ্য।

A
Since 1948

Ahuja

TAILORS & DRAPERS (Regd.)

5/54, Ajmal Khan Road, Karol Bagh,

New Delhi-110 005

☎ Shop : 25764007, 41450181,

Fax : 25738096

e-mail : tailorindia@gmail.com

হিন্দু ধর্ম ও বর্তমান বিশ্ব

ড. তুষার কান্তি ঘোষ

ভারতবর্ষ দেবভূমি। মানুষ এদেশের মাটিতে নিজের জীবনবোধকে উন্নত করে দেবত্ব অর্জন করেছে। তেমনি দেবতারাও এই পুণ্যভূমির ধুলায় জন্মগ্রহণ করেছেন মানব রূপে। দেব ও মানবের মিলিত জীবনচর্চার ফলে এই ভূমি দিব্যভূমি রূপে পরিচিত। এই প্রাচীন দেশ মানব সভ্যতার বিকশিত দেশ। আমেরিকার প্রখ্যাত দার্শনিক উইল ডুরান্ট বলেছেন— ''ভারতবর্ষ আমাদের জাতির জননী এবং সংস্কৃত সমগ্র ইউরোপীয় ভাষার সৃষ্টিকারিণী। ভারতবর্ষ আমাদের দর্শনেরও জননী।'' মাতৃভূমি ভারতবর্ষ বহুদিক থেকে আমাদের সকলের জননী। ভারতবর্ষকে যে দৃষ্টিতে ডুরান্ট দেখেছেন তা হলো তাঁর নিজস্ব দর্শন। সেই দর্শন কিন্তু এক সার্বজনীন দর্শনরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ই বি হ্যাডলি ভারতবর্ষে এলেন— ভারতবর্ষকে দেখলেন এক নির্মোঘ দৃষ্টি নিয়ে। তারপর তিনি অনুভব করলেন— ভারতবর্ষ হচ্ছে মানুষ্যত্বের মন্দির, যেখানে তুমি ভ্রমণ কর তোমার উন্মুক্ত ও পবিত্রতর হৃদয় নিয়ে। চীনের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও রাষ্ট্রদূত হু শি বলেছেন, ''ভারতবর্ষ দু-হাজার বছর যাবৎ আমাদের দেশ জয় করেছে, আমাদের সীমান্তে একটি সৈন্যও না পাঠিয়ে, আমরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলাম ভারতবর্ষের ধর্ম ও তার বিশ্বজনীন চিন্তাধারা। কারণ, আমরা জানতাম এতেই নিহত আছে আমাদের কল্যাণ।'' এই সব অজস্র উক্তি যে সব বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিরা করেছেন তাঁরা ভারতবর্ষের আত্মাকে জেনেছেন। তাই এসব উক্তি তাঁদের শ্রদ্ধামিশ্রিত জীবনবোধের লক্ষ্মণ। কি আছে ভারতের ধর্মে, সংস্কৃতিতে, যা দেখে ফ্রান্সের নোবেলজয়ী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে দুঃখ করে বলেছিলেন, ''আপনাকে দেখে মনে হয় কেন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিনি!''

ভারতের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি

পৃথিবীর মানুষের জীবনে এক চিরন্তন ধ্রুববাদ নিহিত আছে পরার্থের নিমগ্নতায়। মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্য খায়, এটা তার প্রকৃতি। মানুষ যখন অন্যকে শোষণ করে খাদ্য সংগ্রহ করে এটা হলো বিকৃতি। আর মানুষ যখন নিজের সংগৃহীত ও সঞ্চিত খাদ্যকে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে খায়, তা হলো সংস্কৃতি।

সংস্কৃত মানুষ আজ পৃথিবীর কামনীয় বস্তু। এর চাইতে শ্রেষ্ঠ কামনা একবিংশ শতকের পৃথিবীতে আর কিছু নোই।

গত দুই শতকে আমাদের পৃথিবীকে সংস্কৃত করার জন্য তিনটি মতবাদ খুব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা হলো— জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ। এই তিনটি মতবাদেই নির্যাতিত মানুষের কল্যাণকামনার কথা সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু যে কোনো মতবাদকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে গেলে দুটি বস্তুর অবশ্যই প্রয়োজন। একটি হলো আদর্শবোধ, আর হলো জীবনবোধ। আদর্শবোধ সার্থক দর্শনের উত্তরাধিকারীদের সম্পদ। জীবনবোধ অতিতপ্ত ও কণ্টকময় পথের সাধনা। এই দুইয়ের মিশ্রণ ছাড়া মানুষের চেতনা জাগ্রত হয় না। চৈতন্যের অভাবে ব্যর্থ হয় সাধনা--- বিকল হয় মতবাদের সাফল্য। মতবাদ পরিণত হয় ক্রূরতায়।

সংস্কৃতিবিহীন পৃথিবীর রূপ

পৃথিবীতে তাই ঘটল। জাতীয়তাবাদের উগ্রতা পৃথিবীতে নিয়ে এল দুটি বিশ্বযুদ্ধ। আড়াই কোটি মানুষের নিধন ঘটল এই যুদ্ধের যূপকাষ্ঠে। স্বৈরাচারী

শাসনে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা দিবাস্বপ্নের মতো utopia-তেই লিপিবদ্ধ রইল। পুঁজিবাদ গ্রাস করে নিল পৃথিবীর সম্পদ। বিশ্বের ১৫০টা পরিবারের হাতে চলে গেল গোটা পৃথিবীকে দোহন করে নেওয়া ষাট ভাগ সম্পদ। পুঁজিবাদ বহু শাসনব্যবস্থা সমেত সাম্যবাদকেও গ্রাস করে নিল। সাম্যবাদ শ্রেণী চেতনার সংঘর্ষময় পথ ধরে সমাজের স্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নিল। শোষিত সর্বহারা শ্রেণী এক প্রকার দরিদ্রসুলভ দাসত্বকে স্বীকার করে নিল। তাদের কাছে যারা তাদের বিপ্লবের বাণী শুনিয়েছিল। আমাদের পৃথিবী অজস্র যন্ত্রণা বুকে নিয়ে কাতর অভিব্যক্তি প্রকাশ করল— যখন দেখল প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশের একই খৃস্টান ধর্মানুরাগীরা পরস্পর ভাই না হয়ে একে অপরকে হত্যা করছে।

অন্যদিকে দেখা গেল মধ্যপ্রাচ্য সহ বহু দেশের মুসলমান হত্যা করল সুলেহকুলে (বিশ্ব শান্তি) বিশ্বাসী আল্লার অনুগামীদের। এইভাবেই বিগত তের বছরে মুসলমানদের দ্বারা নিহত হলো প্রায় দশ লাখ মুসলমান।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মকে হৃদয়ে না বসিয়ে রাইফেলের নলে বসানো হলো। এইভাবে বিশ্বজুড়ে চলল এক হিংসাশ্রয়ী দাঙ্গা। রাষ্ট্রযন্ত্রকে গ্রাস করে নিল পাশবিক শক্তি। অথচ এই বিশ্বসভ্যতা সকল মানুষের অবদানে গড়া সে হলো সংস্কৃত মানুষ। অসংস্কৃত মানুষ সভ্যতা গড়ে না। সভ্যতা ধ্বংস করে। এই সমস্যা জর্জরিত যুগে পৃথিবীকে আবার ফিরে তাকাতে হলো ভারতবর্ষের দিকে— মুক্তির জন্য, পরিত্রাণের জন্য।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

মানুষকে সভ্য ও মানবোচিত রূপে উন্নীত করার জন্য পৃথিবীতে যেসব মনোভাব ও চেষ্টা কার্যকর হয়েছে, ভারতীয় সংস্কৃতি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই বিশ্বের ইতিহাসে গত পাঁচ হাজার বছর ধরে উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক জীবন বলতে যা বোঝায় তা হলো ভারতবর্ষের জ্ঞানী, ঋষি ও ধর্মাত্মাদের দ্বারা প্রদর্শিত পথ। সেই জীবনবোধকে সুশৃঙ্খলিত ও মানব সমাজের জীবনোপযোগী করে শাশ্বতভাবে যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সেই জীবনের মুখ্য স্বরূপ ভারতেরই প্রদত্ত। বিশ্বের বহু পশ্চাদপর জাতির জীবনে সর্বপ্রধান সংস্কৃতির বাহক শক্তির যে উদ্ভাবনা তা ভারতবর্ষ থেকেই হয়েছিল। বিশ্বে ভারতের এই সভ্যতা প্রচার দেখেই এক ফরাসী লেখক ভারতবর্ষকে L'Inde Civilasatrice অর্থাৎ India the Civilism— সংস্কৃতবাহী ভারতবর্ষ বা পৃথিবীকে সভ্য করার দেশ ভারতবর্ষ বলে অভিহিত করেছেন। ভারতের এই মহান ধর্ম ও সংস্কৃতিতে এমন কোন অপরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল যে বিশ্ব ভারতবর্ষকে আচার্য বা গুরুপদে আসীন করেছিল?

ভারতের ধর্ম হলো শাশ্বতের প্রতিষ্ঠা, জীবনের জীবন

যে মানুষ ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়, ভূমিতে পতন হয় তাকে ভূমি ধরেই অর্থাৎ ধর্মকে ধরেই উঠতে হয়। কারণ ধর্ম ছাড়া মানুষের গতি নাই। মানুষ স্বভাবতই স্বার্থ ও কামনায় আবদ্ধ। সেই বন্ধন হতে ধর্মই দেয় মুক্তি। যখন মানুষ ঈশ্বরকে পিতা বলে আহ্বান করলো তার মধ্য হতে সব বন্ধন কেটে গেল। পরম করুণাময়ের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠল। বুদ্ধদেব যখন বললেন, 'আত্ম দীপো ভব' তখন তিনি মানুষের চেতনার মধ্যেই দীপশিখাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। আমাদের দেশে শত দুর্গতিরকালে মহাপুরুষেরা ভারতের এই সাধনাকে অপূর্বভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। একদিন ভারতের ধর্মসাধনা অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রধানত ছিল সন্ন্যাসীদের বিষয়। আমাদের দেশের মহাপুরুষেরা

সেই সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন ভারতের গৃহস্থের জীবনে। মানুষের মধ্যে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন কর্ম ও ধর্ম সাধনার এক গভীর সংযোগ। আমাদের দেশের উপনিষদের ঋষিরা শিখিয়েছিলেন এগিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো মানবাত্মার জয় ঘোষণা করা।

এই ঋষিরাই শিখিয়েছিলেন সর্বজীবে অমৃত সত্তার উপস্থিতি। ঋষিরাই ঘোষণা করেছিলেন সব আচার ও অনুষ্ঠানের ঊর্ধে হলো মানুষ ও তার মাহাত্ম্য। তাই ঋষিদের বাণী ঘোষিত হলো— ইন্দ্রিয় হতে মন বড়, মন হতে আত্মা বড়, আত্মা হতে বড় পুরুষ। পুরুষ হতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। এগুলো চরম ও পরম পাওয়ার ক্ষেত্র। আসলে পুরুষ মানে জ্যোতি— আত্মা-জ্যোতি অর্থাৎ পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিপ্রীতি।

বর্তমান অত্যাধুনিক যুগে অনেকেই বলবেন এই অগ্রগতির পৃথিবীতে সেই পুরনো কথাগুলো বলে আমাদের চিত্তকে মান্ধাতা আমলের চিন্তা দিয়ে বেঁধে লাভ কি?

কিন্তু এই যুগের পণ্ডিতরাও আজও অনুভব করেন, শাশ্বত সত্যময় ঋষির বাক্যের সঙ্গে আজকের যুগের অত্যাধুনিক চিন্তাধারার কোনো সংঘর্ষ নেই। কারণ ভারতের ধর্ম শাশ্বত, চিরন্তন, সনাতন— এই ধর্মের নামই হিন্দুধর্ম।

হিন্দুধর্মের স্বরূপ

হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম। সনাতন অর্থাৎ আদিকাল হতে যা চলে আসছে। ভারতের ধর্মের সংজ্ঞা হলো, যার দ্বারা নিজের জীবন এবং অপরের জীবনের সমৃদ্ধি বিস্তৃত হয় তাই হলো ধর্ম— 'যে নাত্মনস্তথানেষ্যাং জীবনং বধনজ্ঞাপি ধূয়তে স ধর্মঃ।' মানুষের জীবনকে ধরে রাখে যে গুণগুলো, যা দিয়ে মানুষ আত্মজ্যোতিতে দীপ্ত হয় সেই গুণগুলো (ধৈর্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য, শুচিতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ)-ই আচরণের ধর্ম। অর্থাৎ সনাতন ধর্ম বাহ্যিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধর্ম নয়। এগুলো সকল মানুষের আচরণগত মূল্যবোধের কেন্দ্রীয় সংহতির শক্তিতে আরোপিত।

সনাতন ধর্মের ঋষিরা জীবনরহস্যের তাৎপর্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক নিত্য সত্যের আবিষ্কার করলেন— তার নাম ব্রহ্ম বা আত্মা। সহজ ভাষায় ব্রহ্ম হলো সর্বব্যাপী। সেই পরমসত্য। প্রেমময় ঈশ্বর সর্বজীবের মধ্য দিয়ে যিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। চারটি বেদে ব্রহ্মর স্বরূপকে চার ভাগে দেখা হয়েছে--- প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম (ঋকবেদ, ঐতরেয় উপনিষদ)— প্রজ্ঞা বা জ্ঞান যা আমার আত্মার বিকাশ ঘটায় তিনিই হলেন ব্রহ্ম। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (যজুর্বেদ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ) আমিই ব্রহ্মের অংশ। 'তত্ত্বজ্ঞামি' (সামবেদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ) তুমিই তিনি। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (অথর্ববেদ, মাণ্ডুক উপনিষদ) অর্থ হলো এই আত্মাই হলেন ব্রহ্ম। এই চারটি বিষয়ের মূল কথা হলো ব্রহ্ম আর আত্মা এক। এই যে বিশাল ভাবনা এর মধ্যে যা নিহিত আছে তাই হলো হিন্দুধর্ম চিন্তার মর্ম কথা।

সভ্যতার গতি এগিয়েছে, পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের এই মর্মকথা একই থেকে গেছে। শুধু এই চিন্তাধারার মধ্যে যুগোপযোগী বিশ্লেষণ ভাবনা হিন্দুধর্মের ঋষি ও সংস্কারকেরা বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। ফলে হিন্দুধর্মের প্রবহমানতা চিরন্তনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই বিশ্বের সব জীবই ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বর থেকে সম্ভূত তাই এই ধর্মের ভাবনা চিরন্তন, শাশ্বত সনাতন। এই ভাবনার পূর্ণতা আছে, অসংগঠিত বা খণ্ডিত চিন্তার প্রকাশ এতে নেই, আছে সত্যের প্রকাশ।

হিন্দু-সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক চেতনা

হিন্দুধর্মের এই ভাবনা অনুসারেই সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ তৈরির প্রচেষ্টা হলো। তাই মানুষের জীবনকে ভাগ করা হলো চারটি পর্যায়ে— ব্রহ্মচর্য (যা সংযজ্ঞ ও শিক্ষার কালরূপে চিহ্নিত), গার্হস্থ্য (সংসার ধর্ম পালন ও কর্মসম্পাদনের কাল তথা সভ্যতা নির্মাণের ব্রত সাধনা), বাণপ্রস্থ (সংসারবন্ধন শিথিল করে সমাজের ও ঈশ্বরীয় কাজে সময় ব্যয় করা), সন্ন্যাস (নির্জন বাস সাধনার কাল)। ঋষিরা জানতেন বিদ্যার্জন ও জীবনগঠনের কাল মনুষ্যচরিত্র তৈরি করে। হিন্দুধর্মের মূল্যবোধ অনুযায়ী জ্ঞান ও যোগ অর্থাৎ দেহ ও মনের নিয়ন্ত্রণ— এই দুই দিককেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিকেরা জীবনাতীতের সন্ধানে ফিরলেও আধিভৌতিক জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি। তাই চৌষট্টিটি কলার বিকাশকেন্দ্র এই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ সব

"Let The Mother's Blessings Take Us
To A Brighter Future"

Happy Durga Puja

With Best Compliments From:-

Padmanava Lahiri

WIPE INDIA AUTOMOTIVE PVT. LTD.

286-287, Ecotech 1 Extn
Greater Noida (Uttar Pradesh)

বিদ্যাকেই জানার চেষ্টা করেছে। সংযম, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন যে জীবনের ভিত্তি তৈরি করে এই চিন্তা আমাদের ঋষিদের ছিল।

শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের প্রথম পর্যায়ের ৩০-৩১ বছরের কাল পরিধিতে ২৬ বছর তাঁর কাটল ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও অরণ্যে। চরম সংযম, পরম দারিদ্র ও মনোরম প্রকৃতি আর বিষম রাক্ষসকুলের সংস্পর্শে। ওই সাধনভূমি থকেই বের হয়ে এলেন বিশ্ব সভ্যতা চিরন্তন আদর্শ রামচন্দ্র। পৃথিবীর জীবনবোধকে রামচন্দ্র বেঁধে দিলেন বৈরাগ্যের তাম্রধূসরতার দেদীপ্য মন্ত্রে— যে মন্ত্রে চিরন্তন কল্যাণভাবনা প্রকাশিত হলো— ''তুহু বিনা জীবন কৈসে সমায়া প্রভু রাম'' — হে প্রভু রামচন্দ্র, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন ব্যতীত হবে কিভাবে? পূর্ণ সমর্পণ ভক্তের।

মহাভারতের যুগে ধর্মের বিজয়রথ যাঁদের দ্বারা প্রবাহিত হবে, সেই পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের স্ত্রীর কপালে মহাকাল এঁকে দিয়েছিল বারবার বনবাস আর অজ্ঞাতবাস, তাঁদের তৈরি করার জন্য। ভারতের ভূমিতে মহাব্রহ্মচর্য আর শিক্ষার অঙ্গন থেকেই বের হয়ে এসেছিলেন বিশ্বসভ্যতার প্রবর্তকেরা— যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— 'যেখানে ধর্ম সেখানে জয়'। এই জয়ের জন্য সাধনা চাই, তপস্যা চাই।

ভারতের সংস্কৃতিতে অধ্যাত্মচিন্তার গুরুত্বকেই মহান বা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। অধ্যাত্মচিন্তার বৈশিষ্ট্য কি? মানুষের মধ্যে যখন তিনটি ধারার সংমিশ্রণ ঘটবে তখনই হবে আধ্যাত্মিক যুগ। এই ত্রিধারা চিন্তা হচ্ছে ঈশ্বর, স্বাধীনতা ও একত্ব। আমাদের আধ্যাত্মিকতা জরাগ্রস্ত জীবনের জন্য নয়, শেষ বয়সে একই নামজপ করা অথচ সারা জীবন তো অর্থ ও ভোগের পিছনে ছোটো। এই জরাগ্রস্ত জীবনকে ভারতবর্ষ অধ্যাত্মজীবন বলেনি। এমনকী যারা জাগতিক ব্যাপারে পরিশ্রান্ত, ঈশ্বরীয় সৃষ্টি অলীক বলে নিজেদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে— তাদের জীবনকেও অধ্যাত্মজীবন বলেনি।

ভারতের জীবন হলো 'যোগস্থ কুরু কর্মানি'— গীতার বিধানেও এই জীবনবোধ আছে। এর মূল তত্ত্ব হলো ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহত্তম সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে তারই শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে সমস্ত কাজ করা। ঈশ্বর + আমি = 0 (শূন্য)। শূন্য মানে পূর্ণতা। আধ্যাত্মিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষ তার দৃষ্টি বাহ্যরূপের এমনকী শক্তির মধ্য দিয়ে আত্মাকে খোঁজে। তার জীবন সঙ্কল্প বৈশিষ্ট্য যে, সে মনে করে সে যা চায় তা আজও পায়নি। অর্থাৎ সে পূর্ণতার সংস্পর্শে আসেনি। যতক্ষণ সে আত্মার উপলব্ধি না করতে পারছে ততক্ষণ তার কাছে ভোগের যেসব উপাদান উপস্থিত হচ্ছে তাতে সে স্থায়ীভাবে পরিতৃপ্ত হতে পারছে না। যখন সে ভোগশূন্য, বিকারশূন্য, বিষাদশূন্য, আসক্তিশূন্য সব শূন্যের মধ্যেই জগৎ প্রকৃতিকে মূল ভৌতিক স্তর থেকে আত্মার চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে নিচ্ছে তখনই তার পূর্ণতা। তাই কৃষ্ণ মথুরায় গেলে রাধার সর্বশূন্যতার নামই আধ্যাত্মিক দর্শনে পূর্ণতা।

হিন্দুধর্মের সংস্কৃতি বলছে— তোমার প্রকৃত আত্মাকে ভগবান বলে জান এবং অন্য সকলের আত্মার সঙ্গে এক বলে জান। এই হলো একত্ব। আর যা জান সেই জ্ঞানে জীবনযাপন কর। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভগবৎতুল্য হও। যিনি তোমার সর্বময় কর্তা তাঁকেই সব সমর্পণ করো, যেন সেই পরমপুরুষ তোমার মধ্য দিয়ে জগতে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পন্ন করেন।

তাই আমাদের সংস্কৃতি বলছে— জগতে দুই নাই— 'একমেবাদ্বিতীয়ম'— তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। হিন্দুধর্মের শেষ ছাড়া এই মহৎ ধারণা আজ অবধি মানুষের চিন্তায় পাওয়া যায়নি। এরই নাম অদ্বৈতবাদ। বেদান্তের এই হলো সিদ্ধান্ত। বহু পথে প্রত্যেক পথের নিজস্ব সার্থকতা এবং কোনো পথই যে এককভাবে সম্পূর্ণ নয়— এই স্বীকৃতিই হিন্দুধর্মকে অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভরিয়ে রেখেছে। এর মধ্যে আছে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ, বহুঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ। হিন্দুধর্মের সংস্কৃতি সব রকম আধ্যাত্মিক পরীক্ষানিরীক্ষার এক বিপুল ভাণ্ডারের মতো। আসল

লক্ষ্য হলো বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান। এই হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক সাধনার ফল। এই সংস্কৃতিতে প্রতিটি মানুষের জীবন নদীর মতো সমুদ্ররূপী ঈশ্বরে মিলিত হওয়ার মধ্যেই আছে তার সর্বব্যাপী সর্বাঙ্গীণ সাধনা।

একবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ কামনা— ভারতের সমন্বয়ী সংস্কৃতি

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান মনুষ্যত্বে। প্রতিটি ব্যক্তির যেমন দেহ, মন, বুদ্ধি, আত্মা আছে, আর প্রয়োজনে মানুষ একটির কল্যাণে অপরটিকে উপেক্ষা করে— যেমন আত্মার জন্য দেহকে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরও তেমন দেহ, মন, বুদ্ধি, আত্মা আছে। ব্যক্তির চারটি সত্তার পূর্ণ বিকাশের নামই মনুষ্যত্ব, তেমনি রাষ্ট্রের চারটি পূর্ণ বিকাশের নামই কল্যাণকর রাষ্ট্র। ওই রাষ্ট্রগুলি যখন সম্পূর্ণভাবে একই উদ্দেশ্যমুখী হয় তখনই আসে বিশ্বরাষ্ট্রের বৈভবময় রূপ। আজকের বিশ্বে সকল রাষ্ট্রের মন, বুদ্ধি, আত্মার বিকাশ তো বহু দূরের কথা— বিশ্বরাষ্ট্র দেহের বিকাশই তো পূর্ণাঙ্গভাবেই হলো না। জানিনা, বিশ্ব এই নৈরাজ্যের পথে হাঁটবে কতদিন?

ভারতবর্ষ ব্যক্তি ও সমষ্টিকে একই সাধনায় বেঁধেছে, তাই জীবনদেবতা, রাষ্ট্রদেবতা ও আরাধ্য দেবতাকে একই সঙ্গে সাধনা করেছে। মহীয়সী পৃথিবীর এই সাধনায় শ্রেষ্ঠ পুষ্পাঞ্জলি ছিল প্রেম। তাই ভারতীয় দর্শনে পূজাকেই প্রেম বলেছে, প্রেমই অভিষিক্ত হয়েছে পূজা রূপে। এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যবাদী সাধনা ভারতবর্ষ থেকেই শিখেছে অন্য সব দেশ। হে অদ্বিতীয় প্রভু! হে প্রেমের ঈশ্বর, আমি তোমারই সেবা করতে চাই। তোমার সেবার কাছে আমার স্থূলদেহ এবং আমার অস্তিত্ব, লক্ষ্মণ, অন্তকরণ কিছুই নয়— এমনকী ক্ষুদ্র আত্মাকেও প্রাধান্য দিইনা—

'ন দেহ ন প্রাণাশ্চ সুখম শেষাভিলতিং
চাত্মানাং নান্যাৎ কিমপি এব শেষ ত্বষি ভবাৎ।।'

খৃস্টান জগতে এরই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে বহু বছর পর "He that dwelleth in love dwelleth in God"। মধ্য এশিয়ার সাধকেরা ভারতের এই আত্মাকে খুঁজে পেয়েছেন মরুর দেশে। আসলে ধর্মের সাধক, প্রেম তপস্যার সাধক সে তো খুনি হতে পারে না, লোভী হতে পারে না, বিদ্বেষী হতে পারে না। বিবেকহীন পশুরা বন্দুকের নল দিয়ে যে প্রেমকে ধ্বংস করতে চায়, সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করতে চায় তারা জানে না চেঙ্গিস খান একদিন যেখানে ধ্বংস সাধন করেছিল এখনও সেখানে কিশোরীরা সন্ধ্যায় ঈশ্বরীয় প্রেমের বাতি জ্বালায়— অথচ চেঙ্গিস খানের অস্তিত্বটুকু নেই। তাই দ্বন্দ্বের মধ্যে কল্যাণ নেই—

'জ্ঞানযোগী তারা রহস্য বোঝে, নিঃশেষ করে আমি,
এক মিশে যায় থাকে নাকো কিছু আমি হয়ে যাই তুমি
দ্বৈত জ্ঞানের সীমা পার হলে, তুমি আমি একাকার।
দুয়ে মিশে এক সংবিৎ শুধু লায় লাহি মনে যার।'

বহু সাধকেরা ছিলেন সংস্কৃত মানুষ— একদিকে ত্যাগী, অন্যদিকে প্রেমী। আজকের পৃথিবীতে চাই মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ঈশ্বরীয় প্রেমের ও সংরক্ষণের পূর্ণতা। এটাই বিশ্বকে হিন্দুধর্ম আজও দিয়ে আসছে। একে অস্বীকার করার অর্থই ধ্বংস আর গ্রহণের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্তি।

শেষ বয়সের গল্প

রমানাথ রায়

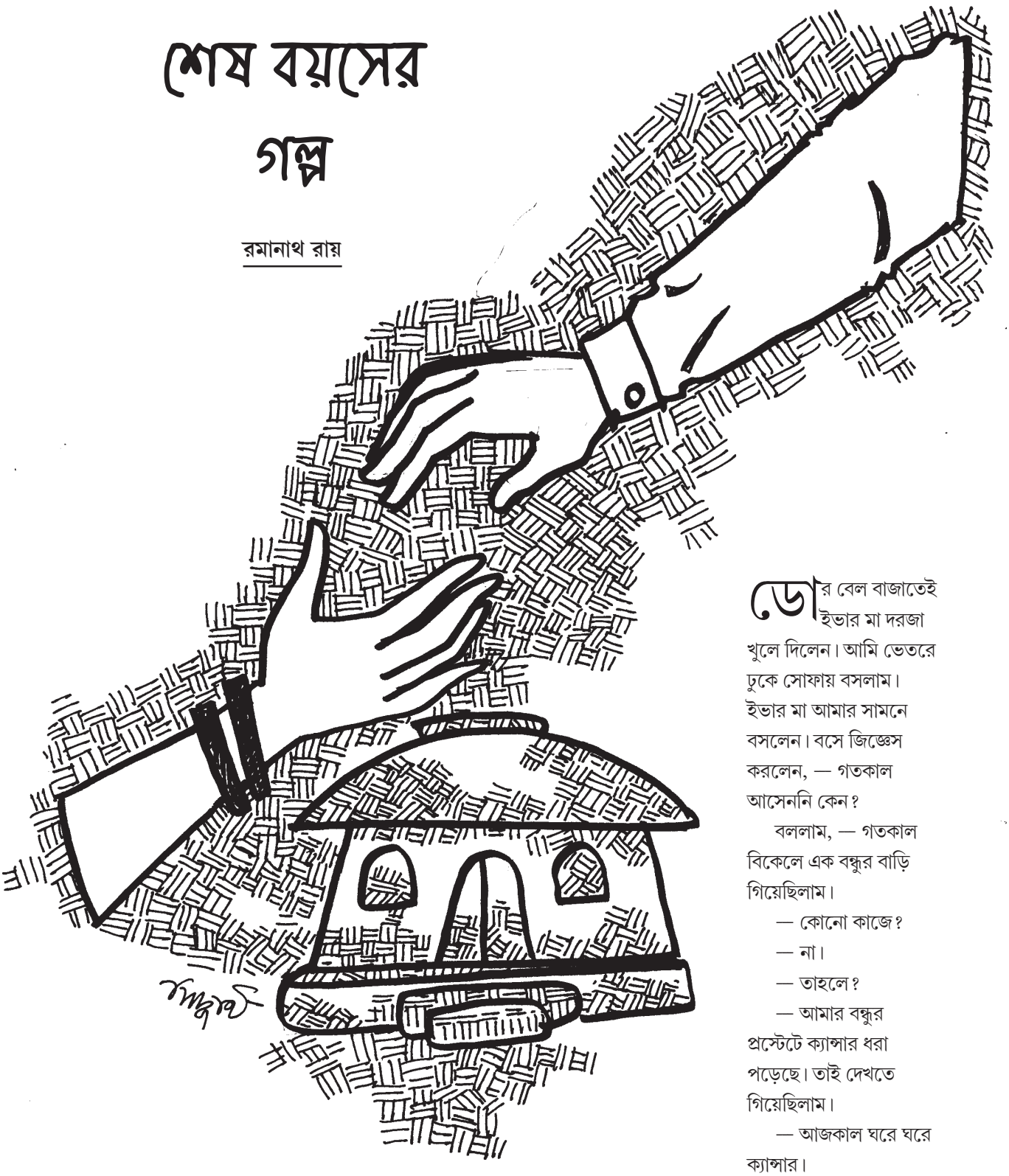

ডোর বেল বাজাতেই ইভার মা দরজা খুলে দিলেন। আমি ভেতরে ঢুকে সোফায় বসলাম। ইভার মা আমার সামনে বসলেন। বসে জিজ্ঞেস করলেন, — গতকাল আসেননি কেন?

বললাম, — গতকাল বিকেলে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম।

— কোনো কাজে?

— না।

— তাহলে?

— আমার বন্ধুর প্রস্টেটে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। তাই দেখতে গিয়েছিলাম।

— আজকাল ঘরে ঘরে ক্যান্সার।

তা শুনে আমি হেসে বললাম, —আমরাও ক্যান্সারে মারা যাব।

ইভার মা একথার উত্তরে বললেন,— এখন আমরা মরলেই বাঁচি। আর ভালো লাগছে না।

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, — মরার কথা বলছেন কেন? কী হয়েছে?

ইভার মা বললেন,— কাল ইভা ফোন করেছিল।

— কী বলছে?

— ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দিতে চাইছে।

— আপনি কোথায় থাকবেন?

— গাছতলায়। — বলে একটু থেমে বললেন,— বাড়ি ছিল, সেটা বিক্রি করে ইভা নিজের নামে এই ফ্ল্যাট কিনল। আমি আপত্তি করলাম না। ভাবলাম, আমি আর ক'দিন আছি! আমাকে নিশ্চয় মেয়ে তাড়িয়ে দেবে না। কিন্তু এখন তো দেখছি...

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, — ওসব আজেবাজে কথা ভাববেন না। ইভা নিশ্চয় আপনার জন্য কিছু ভেবে রেখেছে।

— তা ভেবেছে।

— কী ভেবেছে?

— আমাকে ইভার কাছে গিয়ে থাকতে হবে।

— তাতে ক্ষতি কী?

ইভার মা আমার কথায় রেগে গিয়ে বললেন,— কী বলছেন আপনি! আমি মেয়ের বাড়ি কোন দুঃখে থাকতে যাব? দাসীগিরি করার জন্য?

— দাসীগিরির কথা ভাবছেন কেন? মেয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আপনি চলে যান। আপনি শান্তিতে থাকবেন। অসুখ-বিসুখ হলে মেয়ে দেখাশুনো করবে।

— মেয়ে ফোন করে একবার জিজ্ঞেস করে না, মা তুমি কেমন আছ? আর সে আমার দেখাশুনো করবে! অসুখ হলে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাবে! কী বলছেন আপনি! এখন আফসোস হয়। — বলে ইভার মা চুপ করে গেলেন।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, — কীসের আফসোস?

— আমার যদি আরও দুটো কিংবা নিদেনপক্ষে আর একটা সন্তান থাকত, তাহলে চিন্তা থাকত না। এক সন্তান খারাপ, খুব খারাপ। আপনি নিজেও তো ভুক্তভোগী।

হ্যাঁ, আমিও নিভার মা-র মতো ভুক্তভোগী। আমারও বর্তমানে এক মেয়ে। ছেলে একটা ছিল। কুড়ি বছর আগে সে দুর্ঘটনায় মারা যায়। তারপর ভেবেছিলাম বুড়ো বয়সে মেয়ে আমার দেখভাল করবে। মেয়ে ছিল আমার সান্ত্বনা। ইঞ্জিনিয়ার পাত্র দেখে তার বিয়ে দিলাম। তারপর একদিন মেয়ে-জামাই কানাডা চলে গেল। যাবার পর দু-একবার দেখা করতে এসেছিল। সে প্রায় দশ বছর আগে। এখন আর আসে না। ফোনও করে খোঁজখবর নেয় না। আমিও ফোন করি না। তবু আমি ভালো ছিলাম। কারণ আমার পাশে ছিল আমার স্ত্রী। আমার কোনো দুঃখ ছিল না। নিজেকে কখনও একা মনে হত না। পাঁচ বছর আগে ভুল চিকিৎসায় সে মারা যায়। এখন আমি একা। আমারও ইভার মা-র মতো মনে হয়, আমার যদি আরও একটা কী দুটো সন্তান থাকত, তাহলে বেঁচে যেতাম। আমার কোনো অসুবিধা হত না।

ইভার মা এইসময় আমাকে খোঁচা দিয়ে বললেন, — কী হল? চুপ করে আছেন কেন?

বললাম, — কিছু বলার নেই। তাই চুপ করে আছি। তবে আমি আপনার মতো বোকামি করিনি। ফ্ল্যাটটা আমি স্ত্রীর পরামর্শে নিজের নামেই কিনেছিলাম। ফলে উৎখাত হওয়ার ভয় নেই।

ইভার মা মুখ ম্লান করে বললেন, — আসলে বাড়িটা ছিল ইভার বাবার নামে। ইভার বাবা মারা গেলে আমরা পড়লাম অথৈ জলে। তবু একটা স্কুলে চাকরি করতাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম। খুব কষ্ট করে মেয়েকে মানুষ করেছিলাম। মেয়ে একদিন বলল, মা, এই পুরনো ভাঙাচোরা বাড়িতে আর থাকা যায় না। দুদিন অন্তর কে বাড়ি মেরামত করবে? আমাদের পক্ষে মিস্ত্রি লাগিয়ে বাড়ি সারানো সম্ভব নয়। এটা বিক্রি করে দাও। আমিও ভাবলাম, কথাটা মিথ্যে নয়। তাই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে এই ফ্ল্যাট কিনলাম। মেয়ের কথা ভেবে মেয়ের নামেই ফ্ল্যাটটা কিনলাম। তখন কি জানতাম এর পরিণাম এই হবে! সব কপাল!

এর উত্তরে আমার কিছু বলার নেই। চুপ করে রইলাম।

।। ২।।

কয়েকদিন কলকাতায় ছিলাম না। পাড়ার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মন্দারমণি বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গল্পগুজবে ভালোভাবেই দিনগুলো কাটল। মনে আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। ভাবতে লাগলাম, এবার কোথায় যাব। যাওয়ার জায়গার অভাব নেই। তবে বেশিদূর না যাওয়াই ভালো। ঘুরে বেড়ানোর ধকল শরীরে নেবে না। তবে এবার কোথাও বেরোলে ইভার মাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। ইভার মা কোথায় যান না। যেতে চান না। কেন তা জানি না। এবারও বলেছিলাম, চলুন বেড়িয়ে

আসি। ইভার মা রাজি হলেন না। আমি এবার রাজি করাবোই। মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। ঘুরে বেড়ালে মন ভালো থাকে। বেঁচে থাকার ইচ্ছে হয়। মেয়ে ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিতে চাইছে। দিক। এই বিশাল পৃথিবীতে থাকার জায়গার অভাব হবে? কখনোই না। আর আমি তো আছি। সমস্যা হবে কেন? ইভার মার সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলব। আজই বলব।

কিন্তু আমাকে যেতে হল না। ইভার মা নিজেই এলেন আমার কাছে। চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ। দেখলেই বোঝা যায় খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তবে আমি কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

ইভার মা সোফায় এসে বসলেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম।

ইভার মা চোখে জল এনে বললেন,— খুব বিপদে পড়েছি।

জিজ্ঞেস করলাম,— কেন? কী হয়েছে?

— আপনি তো বেড়াতে গেলেন। তারপর কী হয়েছে জানেন?

— কী হয়েছে?

— মেয়ে এসে ফ্ল্যাট বিক্রি করে চলে গেছে। বলে গেছে, এক মাসের মধ্যে ফ্ল্যাট খালি করে দিতে হবে। আমি এখন কী করব বলুন তো!

— মেয়ে আপনার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেনি?

— আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি যাইনি। বৃদ্ধাশ্রমের কথাও বলেছিল। আমি তাতেও রাজি হইনি। এখন ভাবছি....

— কী ভাবছেন?

— মেয়ের বাড়ি গিয়ে দাসী হয়ে থাকতে পারব না। তার চেয়ে বৃদ্ধাশ্রমেই ভালো।

এবার আমি হেসে বললাম,— আপনি থাকা-খাওয়া নিয়ে এত ভাবছেন কেন?

ইভার মা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, — ভাবব না? কী বলছেন আপনি!

উত্তরে বললাম, — আমি ঠিক কথা বলছি। আমি থাকতে আপনার চিন্তার কারণ নেই।

ইভার মা বললেন,— আপনি আমার কী ব্যবস্থা করবেন?

— আপনি আমার ফ্ল্যাটে এসে থাকবেন।

ইভার মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,— আপনার ফ্ল্যাটে থাকব?

— হ্যাঁ, থাকবেন। আপত্তি আছে?

ইভার মা আমতা আমতা করে বললেন, — আপত্তি নেই। কিন্তু মেয়ে কী ভাববে?

— মেয়ে আপনার কথা যদি ভাবত তাহলে ফ্ল্যাট বিক্রি করে আপনাকে পথে বসাতো না।

— তা ঠিক। কিন্তু...

— কিন্তু কি?

— ফ্ল্যাটবাড়ির লোকেরা কী ভাববে!

— ফ্ল্যাটবাড়ির লোকেরা কি আপনার সমস্যার সমাধান করবে?

— তা করবে না।

— তাহলে এদের নিয়ে ভাবার কোনো মানে হয় না।

একথা শুনে ইভার মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,— ভেবে দেখি।

— অত ভাবার কিছু নেই। বাঁচতে যদি চান তাহলে যা বলছি তা শুনুন।

।। ৩ ।।

চোখের সামনেই সব ঘটে গেল। ইভার মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলেন। দেখলেন, তাঁর ঘরের খাট-আলমারি- ড্রেসিং টেবিল-রেফ্রিজারেটার লরি বোঝাই হয়ে চলে গেল। তিনি একবার ইভাকে বললেন,— এসব বিক্রি করে কি ভালো করলি? উত্তরে ইভা বলল, — ঘর খালি করে দিতে হবে, তাই বিক্রি করে দিলাম। আর এসব তো তোমার পয়সায় কেনা নয়। সব বাবার পয়সায় কেনা। এতে তোমার যেমন ভাগ আছে, আমারও তেমনি ভাগ আছে। তুমি যদি চাও আসবাবপত্র বিক্রির অর্ধেক টাকা তোমাকে দিয়ে দেব। কিন্তু টাকা তুমি কী করবে? তোমার টাকা আমার কাছে থাক। তোমার অসুখ-বিসুখে সে টাকা খরচ করব। ইভার মা বললেন— সবই বুঝলাম। তবে আমি তোর মা। আমার কথাটা তোর ভাবা উচিত ছিল। ইভা বলল,— ভেবেছিলাম বলেই আমার কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তুমি রাজি হলে না। তোমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে চেয়েছিলাম। তুমি তাতেও রাজি হলে না। তুমি চাইলে— বলে একটু থেমে ইভা আমার দিকে তাকিয়ে বলল— ওঁর কাছে থাকতে। তাই থাকো। আমার বলার কিছু নেই।

আমি একথা শুনে বিব্রত হয়ে মাও ও মেয়ের কাছ থেকে সরে এসে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে পড়তে বাধ্য হলাম। কারণ, ইভার কথার মধ্যে এমন একটা বাজে ইঙ্গিত ছিল, যা আমার একদম ভালো লাগেনি। আসলে দোষটা আমারই। মা ও মেয়ের মাঝখানে আমার থাকা উচিত হয়নি। ইভার মা-র অনুরোধে আমি ওখানে গিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, আমার যাওয়া উচিত হয়নি। যাক তো, যা হবার হয়ে

গেছে। এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

একটু পরে চোখের জল মুছতে মুছতে ইভার মা একটা সুটকেস হাতে আমার ফ্ল্যাটে এলেন। আমার পাশে বসলেন।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কাঁদছেন কেন? আমি তো আছি। আপনার কীসের চিন্তা?

ইভার মা বললেন,— মেয়ের কথা তো শুনলেন!

— শুনলাম। খারাপ লাগল। কিন্তু মা-র কথা একবার ভাবল না। একবার ভাবল না মা আর ক'বছর বাঁচবে! এই ক'বছর মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্ল্যাটটা না বিক্রি করলেই পারত। আজকালকার ছেলেমেয়েদের বিবেক বলে কিছু নেই। যাকগে, এসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি আমার কাছে থাকুন।

ইভার মা বললেন,— কিন্তু এখানেও তো আশ্রিত হয়ে থাকতে হবে।

আমি বললাম, — তা কেন থাকবেন? আমার বোন নেই। আপনি আমার বোন হয়ে থাকবেন।

ইভার মা বললেন,— আমারও কোনো ভাই নেই। আপনাকে ভাই হিসেবে পেলে খুব ভালো হবে।

— আমরা শান্তিতে থাকব।

— আমরা সুখে থাকব, আপনি বাজার করবেন। আমি রান্না করব।

— মাঝেমাঝে আমরা বেড়াতে যাব। আমার হরিদ্বার যাওয়া হয়নি। এবার হরিদ্বার যাব। কষ্ট হলেও যাব।

— আমার বৃন্দাবন যাওয়া হয়নি। আমি বৃন্দাবন যাব।

— যাবেন! সব তীর্থস্থানে আপনাকে নিয়ে যাব। একবার কামাখ্যা যাব। একবার পুরী যাব, একবার অমরনাথ যাব।

— আমার মানস সরোবর যেতে খুব ইচ্ছে হয়।

— ঠিক আছে। তারও ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু...

— কিন্তু কী?

— আপনি কি অমরনাথ যেতে পারবেন?

— পারব, পারব। আপনি সঙ্গে থাকলে সব জায়গা যেতে পারব।

— তা না হয় মানলাম। কিন্তু এই বয়সে...! বলে আমি চুপ করে গেলাম।

ইভার মা তা শুনে জিজ্ঞেস করলেন,— আমাদের খুব বয়স হয়ে গেছে?

আমি এর কেনো উত্তর দিতে পারলাম না।

ইভার মা আবার সেই এক প্রশ্ন করলেন,— আমাদের খুব বয়স হয়ে গেছে?

এবারেও কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

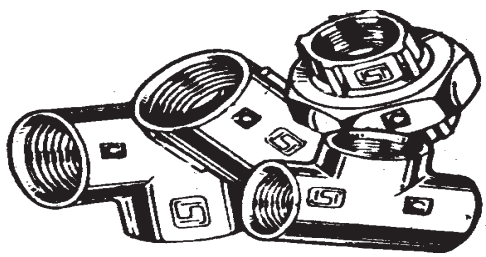

BRAND

MARKED

HIGH GRADE
MALLEABLE IRON
HOT GALVANISED
PIPE FITTINGS

MFD. BY.

Ph. : 260-1548/1566 R-256305, 257593.

CRESCENT ENGG. CORP.

G. T. ROAD, BYE PASS, JALANDHAR

।। ৪ ।।

দু'দিন পরে হঠাৎ ইভা এল। সঙ্গে নিয়ে এল স্বামীকে। ইভা ঘরে ঢুকেই তার মাকে বলল, — তোমার জন্য আমরা যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না।

ইভার মা কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, — কেন? কী হল?

ইভা উত্তেজিত হয়ে বলল,— কী হয়নি?

ইভার স্বামী বলল, — সত্যি বলছি মা, এ খারাপ, খুব খারাপ। — বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,— আপনাকেও বলিহারি মশাই। আপনি একটা বুড়ো মানুষ। আপনার কি লজ্জা ঘেন্না বলে কিছু নেই?

আমি ব্যাপারটা আঁচ করে বললাম,— এসব কী বলছেন আপনি?

— আমি ঠিক বলছি।

— না, আপনি ঠিক বলছেন না। আপনাদের যদি এই বুড়ি মানুষটার প্রতি দরদ থাকত তাহলে আপনারা ফ্ল্যাটটা বিক্রি করতেন না।

— আমরা যা করেছি, ঠিক করেছি। আপনি এর মধ্যে নাক গলাবেন না।

একথায় উত্তেজিত হয়ে বললাম,— নাক আমি গলাইনি। গলাতেও চাই না। কিন্তু আপনারা যদি এই বুড়ি মানুষটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, তাহলে আমি নাক গলাতে বাধ্য হব। দরকার হলে থানা-পুলিশ কোর্ট করব। সেটা কি ভালো হবে?

ইভার স্বামী রেগে গিয়ে বলল,— আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন!

আমি শান্ত গলায় বললাম,— ভয় দেখাব কেন? উনি ইভার মা, আপনার শাশুড়ি। আমি কে? অমি কেউ নই। তবে ওঁর প্রতি খারাপ ব্যবহার কেউ করলে আমার ভালো লাগবে না।

ইভা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার আর থাকতে না পেরে বলল, — আপনি তাই বলে আমার মাকে আপনার কাছে এনে রাখবেন!

এই কথার মধ্যে একটা খারাপ ইঙ্গিত ছিল। আমার তা শুনতে ভালো লাগল না। তাই বললাম,— ঠিক আছে। আমার কাছে তোমার মা-র থাকা যদি পছন্দ না

হয়, তাহলে তুমি তোমার মাকে নিয়ে চলে যাও।

ইভা কথা শুনে তার মাকে বলল, — তোমার এখানে থাকা চলবে না। তুমি আমার সঙ্গে চলো।

ইভার মা বলল,— আমি যাব না। আমি এখানে ভালো আছি।

ইভা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে বলল,— একথা বলতে তোমার লজ্জা হল না!— বলে একটু থেমে বলল,— আমি তোমার কোনো কথা শুনব না। তোমার কাণ্ড দেখে সবাই ছিঃছিঃ করছে।

ইভার মা বলল,— করুক। আমি এখান থেকে যাব না।

— যেতে হবে। — বলে ইভা তার মা-র হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। তারপর মা-র সুটকেসটা নিল। ইভার স্বামী সেকাজে সাহায্য করল।

আমি হতভম্ব হয়ে ঘরের মধ্যে বসে রইলাম।

।। ৫ ।।

ইভার মা চলে গেলেন। না, উনি চলে যাননি। ওঁকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল। বুড়ি মানুষ। বয়স হয়েছে। তাই বাধাও সেভাবে দিতে পারলেন না। জানি না, এখন উনি কেমন আছেন। হয়ত ভলো নেই। ভালো না থাকারই কথা। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। কারণ, আমি তো ওঁর কেউ নই। না হলেও ওঁকে এভাবে জোর করে নিয়ে যাওয়াটা আমার একেবারে পছন্দ হয়নি। তাই থেকে থেকে ওঁর কথা মনে পড়তে লাগল। থেকে থেকে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ইচ্ছে হল, ওঁর খোঁজখবর নিই। কিন্তু কীভাবে ওঁর খোঁজ নেব? ইভার ফোন নম্বর আমার কাছে নেই। ইভার মা'রও নিজস্ব মোবাইল নেই। ফলে আমার পক্ষে ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। তবে ইভার মা'র কাছে আমার মোবাইল নম্বর আছে। উনি ইচ্ছে করলে আমাকে ফোন করতে পারেন। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ চলে গেল। ইভার মা'র কাছ থেকে কোনো ফোন পেলাম না। একবার ভাবলাম ইভার ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করি। ইভা যা ভাবে ভাবুক। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু ইভার ফ্ল্যাটের ঠিকানা আমি জানি না। ফলে চুপচাপ থেকে গেলাম। ইভার মাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করলাম। তবে ইভার মা আমাকে ভুলতে দিলেন না। একদিন আমার মোবাইল বেজে উঠল। ফোনটা ধরলাম।

— হ্যালো...

— আমি ইভার মা বলছি।

— বলুন।

— আপনি কেমন আছেন?

— একরকম। আপনি কেমন আছেন?

— ভালো নেই।

— কেন?

— এখন ফ্ল্যাটে কেউ নেই। তাই আপনাকে ফোন করছি। ওরা থাকলে ফোন করতে পারতাম না। আমি খুব বিপদে পড়েছি।

— কেন? কী হয়েছে?

— ব্যাঙ্কে আমার কয়েক লাখ টাকা আছে। আর ব্যাঙ্কের ভল্টে আছে পনের-কুড়ি ভরির মতো গহনা। আমার মেয়ে-জামাই রোজ আমাকে চাপ দিচ্ছে। ওই টাকা, গহনা তুলে নিতে বলছে। কী করি বলুন তো?

— আমার কিছু বলার নেই। আপনার যা মনে হয় তাই করবেন।

— আমি মরার আগে টাকা তুলতে চাই না। গহনাও বাড়ি আনতে চাই না। কিন্তু মেয়ে-জামাই ছাড়ছে না। রোজ তাগাদা দিচ্ছে। আমার আর একদিনও এখানে ভালো লাগছে না। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

আমি এবার একটু চিন্তা করে জিজ্ঞেস করলাম,— আপনার ব্যাঙ্কের কাগজপত্তর, ভল্টের চাবি কার কাছে আছে?

— মেয়ের কাছে। অনেকদিন ধরেই আছে। তবে সব আমার নামে। ভয়ের কিছু নেই।

— তাহলে এক কাজ করুন। আপনার যা কিছু আছে মেয়েকে দিয়ে দিন।

— তারপর?

— তারপর ওরা আর আপনাকে আটকে রাখবে না। এখন বুঝতে পারছি, এই টাকা-পয়সা আর গহনার জন্য আপনাকে ওরা নিয়ে গেছে। আপনি ওসব ওদের দিয়ে দিলে ওরা আপনাকে মুক্তি দেবে।

— কিন্তু আমার চলবে কীসে?

— আপনি তো পেনশান পান। আপনার চিন্তা কীসের! এছাড়া আপনি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন।

— কিন্তু ওরা কি আমাকে আপনার কাছে থাকতে দেবে?

— দেবে। আপনার টাকা-পয়সা গহনা পেলে থাকতে দেবে।

— কোনো আপত্তি করবে না?

— না।

।। ৬ ।।

ওহ্ হো, একটা ভুল হয়ে গেল। একটু আগে যে ফোন নম্বর থেকে

ইভার মা আমাকে ফোন করেছিলেন, সে ফোন নম্বরটা কার তা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম। ইভার মা'র মোবাইল নেই। ঘরে ল্যান্ডলাইন আছে কিনা জানি না। তবে আমার মোবাইলে যে নম্বরটা পেয়েছি সেটা মোবাইলের নম্বর, ল্যান্ডলাইনের নয়। তাহলে কার মোবাইল থেকে ইভার মা আমাকে ফোন করেছিলেন? তবে ইভার মার স্মৃতিশক্তি প্রখর। আমার মোবাইল নম্বরটা ভোলেননি। ঠিক মনে রেখেছেন। আমি জানতাম, নম্বরটা ওঁর কাছে আছে। এর আগে ওঁর এখানকার ফ্ল্যাটের ল্যান্ডলাইন থেকে আমাকে ফোন করতেন। কোনো অসুবিধা হতো না। কিন্তু এই নতুন নম্বরটা কার জানা দরকার। ফলে একসময় নতুন নম্বরে আমি ফোন করলাম। ফোন ধরলেন এক মহিলা!

— হ্যালো...

— ইভার মাকে আপনি চেনেন?

— চিনি।

— উনি কোথায় থাকেন?

— উনি নিজের ফ্ল্যাটে থাকেন। উনি এখন আমার কাছে আছেন। আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন?

— বলব।

— তাহলে লাইনটা কাটবেন না। আমি মোবাইলটা ওঁকে দিচ্ছি।— বলে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন।

একটু পরে ইভার মা'র কথা ভেসে এল।

— হ্যালো...

— আপনার সঙ্গে কথা বলতে হলে কী এই নম্বরে ফোন করব?

— না। এই মোবাইলটা অন্য একজনের।

— তাহলে কথা বলতে হলে কী করব?

— আপনার ফোন করার দরকার নেই। আমিই ফোন করব।

— আপনাদের ফ্ল্যাটে ল্যান্ডলাইন নেই?

— না।

— ঠিক আছে। আমি তাহলে ফোন করছি না। আপনিই ফোন করবেন।

— সেটাই ভালো। কারণ, মেয়ে-জামাই আমাদের কথা জানুক, তা আমি চাই না। তবে আমি আর বেশিদিন এখানে থাকব না। এখানে আমার একদম ভালো লাগছে না। তাই ওপরের ফ্ল্যাটে এসে অন্যের মোবাইল থেকে আপনাকে ফোন করলাম।

— দরকার হলে আবার করবেন। আমি আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।

।। ৭ ।।

না, ফোনের অপেক্ষায় আর থাকতে হল না। ইভার মা একদিন সশরীরে এসে হাজির হলেন। হাতে সুটকেস। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, — কী ব্যাপার? হঠাৎ একা এভাবে...

ইভার মা আমার কথার উত্তর না দিয়ে সোফায় বসলেন। বসে বললেন,— আমি আপনার কথা রাখতে পারলাম না।

আমি কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম,— কী কথা?

— আপনি আমাকে আমার টাকাপয়সা গহনা মেয়েকে দিয়ে দিতে বলেছিলেন। আমি দিইনি। আমি মেয়ের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের পাশবই চেক বই ভল্টের চাবি সব আদায় করে নিয়ে এসেছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— আপনি একাজ করতে গেলেন কেন?

ইভার মা বললেন,— আপনার কথা শুনে আমি সবই মেয়েকে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ইভাদের ওপরের ফ্ল্যাটের মহিলা একাজ করতে বারণ করলেন। তিনি বললেন, — দিদি, খবরদার একাজ করবেন না। করলে আপনার দুঃখের শেষ থাকবে না। তারপর মেয়েকে যখন বললাম, বেঁচে থাকতে আমি আমার টাকাপয়সা গহনা কিছু তোকে দেব না, তখন মেয়ের চেহারাই বদলে গেল। মেয়ে এবং জামাই মিলে যেভাষায় আমাকে গালাগাল দিল তা বলার মতো নয়। তখন আমি চিৎকার চেঁচামেচি করে ব্যাঙ্কের পাশবই, চেকবই, ভল্টের চাবি আদায় করে চলে এলাম। তবে এই কাজে ওপরের ফ্ল্যাটের মহিলা আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। নইলে আদায় করতে পারতাম না। ওই মহিলার স্বামী হাইকোর্টের উকিল। তিনিও সাহায্য করেছেন।

আমি ইভার মা'র কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এখন আমার কাছে থাকবেন?

ইভার মা বললেন,— হ্যাঁ।

— কীভাবে থাকবেন? ভাই-বোন হিসেবে?

— না।

— তাহলে?

— স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকব। থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে না। আপনার কি এতে আপত্তি আছে?

— আমার! ভেবে বলব। — বলে অবাক হয়ে ইভার মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

INTERNATIONAL PANAACEA LTD.™

Bio-Fertilizers & Bio-Pesticides Certified Input For Organic Farming

TM

Manufactured & Marketed by :

International Panaacea Ltd.

(An ISO 9001 : 2008 Company)

E-34, 2nd Floor, Connaught Circus, New Delhi-110001, India
Tel. : 011-43667200-06, Fax : 011-23418889, Website : www.iplbiotech.com
Customer Care No. : +91-11-23418880 (All working days-10 am to 6:30 pm)
Works : Plot No. 42 to 46, Sector-5, IIE, SIDCUL, Haridwar-249403, Uttarakhand

Serving Through Biotechnology

HUNGER FREE HEALTHY LIVING

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চিত্তরঞ্জন সুতারের অবদান

অচিন্ত্য বিশ্বাস

বছর দুই আগে আমি যখন চিত্তরঞ্জন সুতার (২৩ মার্চ, ১৯২৮ - ২০ নভেম্বর ২০০২) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছি, দুয়েকজন বাংলাদেশের গবেষক অধ্যাপককে মেল করে সহযোগিতার আবেদন করি। অচিরেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল। স্বাধীনতা সংগ্রামী চিত্তরঞ্জন সুতার সম্পর্কে বাংলাদেশের অধিকাংশ গবেষক অধ্যাপক অদ্ভুত নীরবতা দেখালেন। এঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। বিশেষত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়ায় পেলাম প্রচ্ছন্ন ভীতি। তাঁরা যেন চিত্তরঞ্জন সুতারের নাম শোনামাত্র ছ্যাঁকা খেয়েছেন এমন ভাব দেখালেন। এক আধজন সরকারি বা আধা সরকারি চাকরি করেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়া যা ঘটল তাও অবাক হওয়ার মতো। একজন তো জানালেন উনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন করেনইনি। উনি বস্তুত নাকি ভারতের গুপ্তচর ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন সুতার

মঞ্জুশ্রী দেবী

আমার মনে হল কোথাও কোনো বড়সড় গোলমাল বা শূন্যতা আছে। চিত্তরঞ্জন সুতারের নাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় থেকে মুছে দেবার কোনো চক্রান্ত থেকে থাকবে এর আড়ালে। হতে পারে বাংলাদেশ ১৯৭১-এর স্বাধীনতার মূল্যবোধ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে বা হতে চাইছে। উক্ত স্বাধীনতার জন্য তাদের পূর্ব প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে ধারণা ভালোমতো গড়ে না ওঠার কোনো না কোনো রহস্য আছে।

দু'বছর ধরে বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ করছি। ধীরে ধীরে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তুলনা করে দেখতে গিয়ে বুঝেছি সাধারণভাবে বাঙালি ইতিহাস-বিস্মৃত জাতি। ইতিহাসের সঙ্গে যে নিরাসক্ত নিরপেক্ষ সত্যসন্ধানী দৃষ্টির সম্পর্ক— আমাদের সত্তায় জীবনচর্যায় তার অভাব আছে। তা না হলে মাত্র আটচল্লিশ বছরের মধ্যে এত বড় একটা ঘটনার অনুপুঙ্খ আমরা ভুলে গেলাম। তৈরি হল বিচিত্র উপকথা, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি! আমার কাছে গবেষণা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধি পেয়েছেন শেরপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুধাময় দাস। তাঁর বিষয় ছিল--- 'বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রতিফলিত জাতীয় চেতনা'। সেই গবেষণা পরিচালনা করার সময় লক্ষ্য করেছি সে দেশে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ কী বিপুল পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত, স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত কিছু উপন্যাসে লেখকরা যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যমে কোনো জাতির মনের ইতিহাস যতটা পাওয়া যায়— বস্তুধর্মী ইতিহাস তো তেমন পাওয়া সম্ভব নয়। এই কাজটি কেমন হয়েছে বাংলাদেশে? যতটুকু লক্ষ্য করলাম— খুব উচ্চস্তরের কাজ তেমন হয়নি। উপরন্তু যুক্ত হয়েছে কিছু অদ্ভুত অদৃশ্য কিন্তু অনুভববেদ্য সংস্কার। আমার মনে প্রতীতি জেগেছে চিত্তরঞ্জন সুতারকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। একথা প্রমাণ করার জন্য এই লেখা নয়। আমি এখানে চেষ্টা করব চিত্তবাবুর ভূমিকাকে সম্ভব মতো নিরাসক্তভাবে উপস্থাপন করতে।

কাজটি করতে গিয়ে বেশ কিছু মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য নিয়েছি। গ্রন্থঋণ প্রয়োজন, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করব।

ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র শ্রীমান সুমন দাস আর শ্রীমতী সম্পাদন চক্রবর্তীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। ওরা যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করে চিত্তবাবু সম্পর্কে তথ্য আহরণে সাহায্য করেছে।

।। ২ ।।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন সুতার নেহাৎ অপরিচিত ছিলেন না। তাঁর জন্মগ্রাম ব্যাসকাঠী, থানা স্বরূপ কাঠী (বর্তমানে নাম বদল করা হয়— 'নেছারাবাদ')। পড়াশুনো করছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে, অর্থনীতি নিয়ে। সংস্কৃত কলেজে পড়েছিলেন বেদান্ত দর্শন বিষয়ে। পিতা ললিতকুমার সুতার আর মা বেলকা দেবী তাঁর অল্প বয়সে মারা যান। জন্মের আগেই দুই দিদির বিবাহ হয়। ছোট ভাই সত্যরঞ্জন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় মারা যায়। পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত সামান্য সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন জ্যেঠামশাই। ছাত্রবয়সে পরিচয় ঘটে সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দগিরির, তাঁর সংস্পর্শে গড়ে ওঠে নিরাসক্ত মানবতাবাদী মন। ১৯৫২ নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা হয়, প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবার কলকাতার আশপাশে চলে আসে। শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান চিত্তরঞ্জন। পাকিস্তান হবার পর মহম্মদ আলি জিন্নাহর প্রতিশ্রুতি, নতুন রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ— তা সামনে রেখে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও সংহতির চেষ্টা করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সংসদে প্রবেশ করেন চিত্তরঞ্জন। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকেন তিনি। পরিচয় ঘটে ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং মওলানা হামিদ খান ভাসানী'র সঙ্গে। এই তিন নেতা তখন যুক্তফ্রন্ট গড়েছিলেন। তিনশো আসনবিশিষ্ট সংসদে তাঁদের প্রাপ্ত আসন ছিল ২৯১। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সরকার চালালেন মাত্র ৩৯ দিন! গভর্নর হলেন ইস্কান্দার মির্জা।

১৯৫৬ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তানকে 'Islamic Republic of Pakistan' নামে ঘোষণা করে; বলা হয় পাকিস্তানের মালিক হলেন আল্লাহ। মুসলমান ছাড়া কেউ পাকিস্তানের প্রধান হতে পারবেন না। এতদিন ধরে প্রচলিত পূর্ববঙ্গ হল পূর্ব পাকিস্তান। চিত্তরঞ্জনবাবু এই নীতির বিরোধিতা করেন। আবু হোসেন সরকার পরিচালিত সরকারকে তিনি সমর্থন করলেন না। আবু হোসেন পদত্যাগ করেন— নতুন সরকার গঠিত হয় আওয়ামী লীগের আতাউর রহমানের নেতৃত্বে। এসময় সীমান্তে চোরাচালান হচ্ছে, তাতে যুক্ত থাকছে সংখ্যালঘু হিন্দুরা— এই অভিযোগ নিয়ে শোরগোল শুরু হয়। সংসদের পক্ষে একটি তদন্ত দল গঠিত হয়। তার নেতৃত্ব দেন চিত্তরঞ্জন সুতার। তদন্ত দলের অন্য সদস্যরা ছিলেন মহিউদ্দিন আহমেদ, আবদুল করিম আর নগেন তালুকদার। সীমান্ত অঞ্চলে পরিদর্শন করে চিত্তবাবু প্রতিবেদন পেশ করেন। সংখ্যালঘুরা চোরাচালানে যুক্ত এই অভিযোগ সর্বৈব ভ্রান্ত— সেকথা তাঁর প্রতিবেদনে ছিল। এসময় মওলানা ভাসানীর সঙ্গে চিত্তবাবুর সম্পর্ক নিবিড় হয়। ২৬ এপ্রিল ২০১৪, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় কথা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক সাহসী মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবীর জানিয়েছেন, চিত্তরঞ্জন সুতার ছিলেন ভাসানীর ন্যাপ তথা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সদস্য। তখনকার অধিকাংশ হিন্দু নেতাই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির খোলা সংগঠন 'ন্যাপ'-এর সদস্য। একথার স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পাইনি। পরবর্তী সময়ে (সে সময়কার কথা সবিস্তারে লিখব) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা কলকাতায় তখনকার সি পি আই-এর নেতাদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের চেষ্টা করেন। চিত্তবাবুর সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগের প্রমাণ নেই। ১৯৫৫ সালে বাটনাতলা উচ্চবিদ্যালয়ে চিত্তবাবুর ডাকা একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির মহিউদ্দিন আহমেদ এবং নলিনী দাস। তবে অনুশীলন সমিতির দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, কংগ্রেসের প্রাণকুমার সেন আর আওয়ামি লীগের মুজিবুর রহমান আবদুলও ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন সুতার চাইতেন মৌলবাদমুক্ত হোক গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ একটি আধুনিক রাষ্ট্র পাকিস্তান। ১৯৫৬ সালের ঘোষণা যে পাকিস্তানের জনক জিন্নাসাহেবের ঘোষিত নীতির সঙ্গে মেলে না— এই কথা তিনি প্রচার করতেন। এর মধ্যে কোনো দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র বা ভারতের চরবৃত্তির প্রমাণ থাকার কথা নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ ছিল সংখ্যালঘু— হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান, তাদের হয়ে কথা বলতে চেয়েছেন চিত্তরঞ্জন সুতার। এর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। (দেখুন: 'সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস নির্মূল / সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয়'; একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ১৩ মার্চ, ২০১৪; ঢাকা - ১২১২; ১৮ পৃঃ)। তিনি চেয়েছেন যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি। পৃথিবীর কোনো সংখ্যালঘু নেতার পক্ষে এ ছিল যথেষ্ট সাহসের কাজ। তিনি মনেপ্রাণে জন্মভূমিকে শুদ্ধ, আধুনিক, মুক্ত ও মানবিক করার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন।

১৯৫৮ সালে আয়ুব খান পাকিস্তানের সেনাপ্রধান হিসাবে 'মার্শাল ল' জারি করলেন। ১৯৫৬-র সংবিধান বাতিল হয়ে এল নতুন সংবিধান। তবে এবারও বলা হল, পাকিস্তানের প্রধান হতে পারবেন একজন মুসলমান। তার সঙ্গে এল Basic Democracy-র ধারণা। এব্যাপারে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র বিরোধ দেখা দিল— চিত্তরঞ্জন এই গণআন্দোলনে অংশ নিলেন।

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে ভয়ঙ্কর দাঙ্গায় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত হল। অথচ এব্যাপারে তাদের কোনো দোষ ছিল না। কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদের রক্ষিত হজরতের

চুল হারিয়ে গেছে— এই ছিল দাঙ্গার অজুহাত। দাঙ্গা নয়, একতরফা অত্যাচার, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড। এরপর লক্ষ লক্ষ হিন্দু দেশত্যাগ করে। পাকিস্তানের শাসনভার তখন গভর্নর মোনায়েম খাঁর হাতে। ঢাকা শহরের এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথা অনুযায়ী, তিনি অত্যাচার থামানোর কোনো চেষ্টাই করেননি।

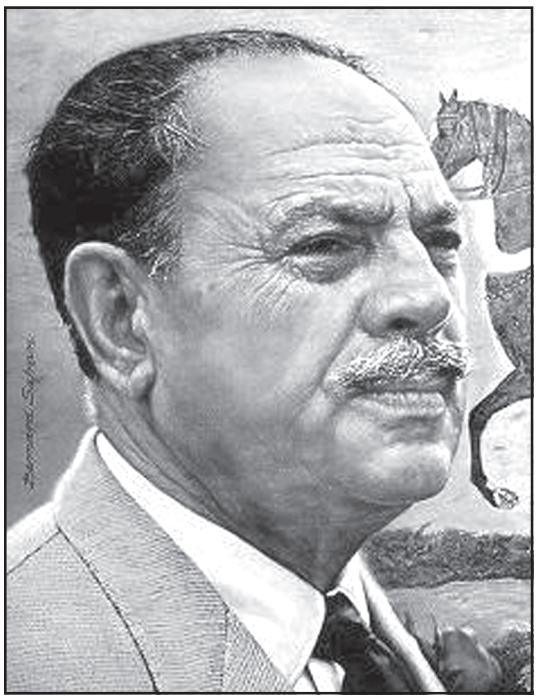

আয়ুব খান

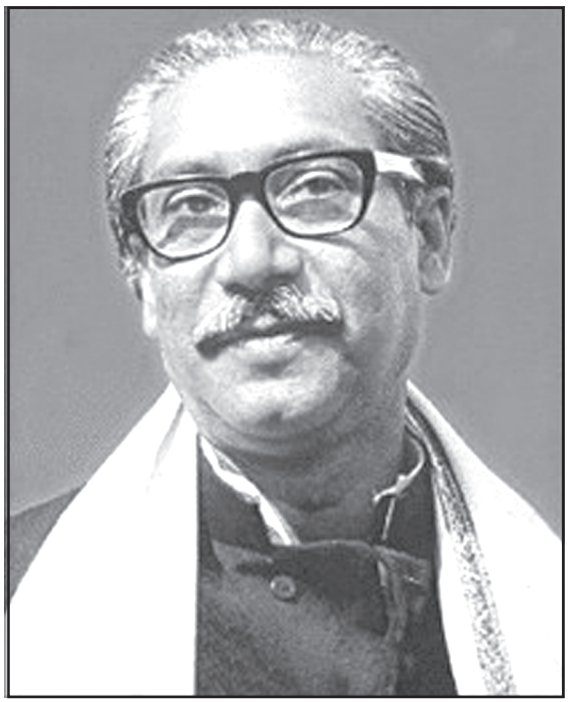

মুজিবুর রহমান

(সূত্র: 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্তরালে', অপ্রকাশিত গ্রন্থ; অসম্পূর্ণ এই গ্রন্থ দেখতে দিয়েছেন লেখক বিপদভঞ্জন বিশ্বাসের পুত্র স্বপন বিশ্বাস; তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই)। বিপদভঞ্জন বিশ্বাস চিত্তরঞ্জন সুতারের সংগ্রামী জীবনের অন্যতম নিরলস সহযোগী। তাঁর ভূমিকাও বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র'-এর কোথাও বিপদবাবুর নাম নেই। মোনায়েম খাঁ কেমন শাসক ছিলেন তা বোঝার ইচ্ছা হলে সেলিমা হোসেন-এর উপন্যাস 'সোনালী ডুমুর' পড়ে দেখতে পারেন।

১৯৬৪ সালে আয়ুব খান একটি অধ্যাদেশ জারি করলেন। এই অন্যায় অধ্যাদেশ (East Pakishtan Disturbed Person Rehabilation Ordinance 1964) -এর লক্ষ্য পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরা যেন বাস্তুজমি ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে না পারে। বলা হয়েছিল সন্ত্রস্ত হিন্দুরা যেন দেশত্যাগ না করে তেমনি 'মানবিক' উদ্দেশ্য নিয়েই এই অধ্যাদেশ জারি হল। একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর এরকম অত্যাচারের তুলনা আর কোথাও আছে কিনা জানি না। অসম সাহসী চিত্তরঞ্জন সুতার ঢাকা হাইকোর্টে এই অধ্যাদেশ বাতিল করার উদ্দেশ্যে রিট পিটিশান দাখিল করেন। আইনজীবী সবিতারঞ্জন পালের সাহায্যে এই মামলা করার পর সংখ্যালঘু মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার হয়। এতে কাজের কাজ কিছু হবে না, উপরন্তু অত্যাচার আরও বাড়বে। আশ্চর্যের কথা, মামলায় জয়ী হলেন চিত্তবাবু। হিন্দুরা জমি বিক্রির অধিকার ফিরে পেল। পাকিস্তানের ধর্মীয় মৌলবাদ, সেনাশাসনের বিরুদ্ধে এই সমস্ত সংগ্রামের ফলেই গড়ে উঠেছে স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ইতিহাসের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে একথা উপেক্ষা করা অন্যায়।

।।৩।।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধ শুরু হয়। অনেক নেতার সঙ্গে চিত্তরঞ্জন সুতারকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্বরূপ কাঠী, বরিশাল কারাগার হয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। আয়ুব খান জারি করলেন 'পাকিস্তান ডিফেন্স রুল'। চিত্তবাবুকে পাকাপাকিভাবে বন্দী রাখার ব্যবস্থা হল এই আইন মারফত। উপরন্তু বন্দী চিত্তরঞ্জনকে অনুরোধ করা হল 'ন্যাশনাল হুক ওয়ার্ক প্রোগ্রাম'-এ বেতার ভাষণ দিতে। উদ্দেশ্য, যুদ্ধের জন্য ভারতকে দায়ী করে বক্তৃতা দিলে পাকিস্তানের হিন্দুদের বার্তা দেওয়া যাবে। চিত্তবাবু এই ভাষণ দিতে অস্বীকার করেন। ১৯৬৬ সালে চিত্তরঞ্জনকে স্থানান্তরিত

করা হল অন্য একটি নির্জন সেলে।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই ছয়দফার সঙ্গে আরও পাঁচখানা যুক্ত করে ছাত্ররা দাবি করল এগার দফা। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল হয়ে উঠল। উক্ত দাবির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র মুদ্রা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার বিষয় ছিল। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার স্পন্দন এইসব দাবিপত্রে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিল। প্রমাদ গোনে সরকার। শেখ মুজিবুর রহমান বন্দী হলেন। তাঁকেও প্রেরণ করা হল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। এখানে একজন কারারক্ষী দুই জননেতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর সহযোগিতায় স্বাস্থ্যের অজুহাতে হাসপাতালে দুই নেতার সাক্ষাৎ হতে থাকে। উভয়ের একটি বিষয়ে মতৈক্য ঘটে— পূর্ব পাকিস্তানের গণআন্দোলন ছয় দফা ছাড়বে না, এর শেষ পরিণতি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন। শেখ মুজিবুর মনে করতেন নির্বাচনে প্রবলভাবে বিজয়ী হলে পশ্চিম পাকিস্তান জোর জবরদস্তি করবে না। সহজ নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করবে। চিত্তরঞ্জন এই মত মানেননি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, কোনো দেশের সামরিক শাসক বিনা রক্তপাতে এইভাবে স্বাধীনতার দাবি মানে না। শেষে উভয়ে ভাবতে থাকেন, স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রস্তুতিতে কোনো বহির্রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ অনিবার্য। কিন্তু কোন দেশ? চীন পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের অন্ধ সমর্থক। ব্রহ্মদেশ দুর্বল। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত— ইচ্ছা থাকলেও সহায়তা করবে না। ভারত সহায়তা করতে পারে। কিন্তু চীন আক্রমণের পর ভারত ১৯৬৫-র যুদ্ধে নৈতিক বিজয় অর্জনের পরও পাকিস্তানকে শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী হিসাবে প্রকাশ্যে দেখতে চাইবে না। মুজিবুর রহমানের এব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের ভূমিকা নিয়ে চর্চা করেছেন— তাঁরা এসব জানেন। পুনরুক্তি করার প্রয়োজন দেখছি না। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির জন্য একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধির কথা ভাবছিলেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান। স্থির হয়, চিত্তরঞ্জনবাবু হবেন সেই প্রতিনিধি। বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, সংযত আচরণ, নিষ্ঠায় চিত্তবাবু মুজিবুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি চিত্তবাবুকে তখন বলতেন 'মাই লিডার'। সেই ডাক চিরদিন বজায় ছিল।

কিছুদিনের মধ্যে শেখ মুজিবুর মুক্তি পেলেন। চিত্তবাবুর বন্দীদশা ঘুচল না। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা অজুহাতে ৩৫জন আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে শেখ মুজিবুর আবার কারারুদ্ধ হলেন। আবার ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হল তাঁকে। আবার কিছুদিন দুই জননেতার মধ্যে মত বিনিময় হল।

চিত্তরঞ্জনবাবুর স্ত্রী মঞ্জুশ্রী সুতার ছিলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মঞ্জুশ্রী দেবীর ভূমিকাও অবিস্মরণীয়। চিত্তবাবুর মুক্তির দাবিতে মামলা করলেন মঞ্জুশ্রী দেবী। ফল বের হল। ৩১ মাস কারারুদ্ধ থাকার পর ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে মুক্তি পেলেন চিত্তরঞ্জন সুতার।

২৬ মার্চ ১৯৬৯, আয়ুব খান পদচ্যুত হলেন, নতুন শাসক হলেন সামরিক প্রধান আগা মোহাসুদ ইয়াহিয়া খান। ঘোষণা হল ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচন হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জাতীয় পরিষদ গঠনের চার মাসের মধ্যে পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন সংবিধান রচনা করবেন। এই সংবিধান অবশ্য পাকিস্তানের ঐক্য সংহতিকে কোনোভাবেই ব্যাহত করবে না— এটি ভালো মতো খেয়াল করেই রাষ্ট্রপতি তা অনুমোদন করবেন। এই ঘোষণাকে "Leagal Frame work order" নামে অভিহিত করা হয়।

নতুন সংবিধানে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিত্তরঞ্জন সুতার আহ্বান করলেন একটি সম্মেলন। এ নিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট কথাবার্তা হয়। তিনি শেখসাহেবকে বলেন আওয়ামী লীগের কোনো স্তরেও সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি নেই। অথচ তারা প্রথমাবধি আওয়ামী লীগের সমর্থক। মুজিবুর ব্যাপারটি মেনে নিলেন। বললেন, সংখ্যালঘুরা তাদের দাবি উত্থাপন করলে তিনি নতুন সংবিধানে তা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবেন। লাহোরে এনিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু আহূত হন। তাঁকে জানাবার জন্য চিত্তবাবু ডাকলেন সংখ্যালঘু সম্মেলন।

২২ ডিসেম্বর ১৯৬৯, ঢাকা বার লাইব্রেরিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত হয়েও আসতে পারেননি বিশিষ্ট দেশনেত্রী নেলী সেনগুপ্তা (১২.১.১৮৮৬ - ২৩.১০.১৯৭৩) আর স্বাধীনতা সংগ্রামী ত্রৈলোক্য মহারাজ (১৮৮৯ - ৯.৮.১৯৭০); তবে তাঁরা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সম্মেলনে দুইজন নেতাকে তরুণ ছাত্ররা কথা বলতে বাধা দেয়। তাঁরা হলেন আয়ুব খানের সহযোগী, ভারতকে আক্রমণকারী বলে অভিহিত করা— পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা খুব ভালো আছে ইত্যাদি মন্তব্য করা নেতা ভবানীশঙ্কর বিশ্বাস আর ন্যাপ-নেতা নীরদ নাথ। এথেকেও বোঝা যায়, শাহরিয়ার কবীরের উক্ত মন্তব্য (২৬ এপ্রিল, ২০১৪-এ বলা) ঠিক নয়।

সম্মেলন হল পরের দিনও। ফরাসডাঙ্গার একটি সভাকক্ষ স্থির করা হয় ২২ তারিখেই। জীবনের সব ক্ষেত্রে শিক্ষা, চাকরি, প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতিতে সংখ্যালঘুরা সংখ্যানুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব পাক এই দাবি তোলা হয় সম্মেলনে। সভাপতি ছিলেন মুনীন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য। সম্মেলনটি নানাদিক থেকে সফল। ৪৭৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি হয়েছিল। পর পর দাঙ্গা অত্যাচারে বিভ্রান্ত সংখ্যালঘুরা তখন ভারতে আশ্রয় নিয়েছে— তখন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মাত্র সংখ্যালঘু। একেবারে

নগণ্য নয়। তাদের হয়ে এই কণ্ঠস্বর তাই তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। ঐদিন সংখ্যালঘু সম্মেলনের একটি অস্থায়ী কমিটি তৈরি হয়। আহ্বায়ক চিত্তরঞ্জন সুতার। সদস্য হন : মুনীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিনয়ভূষণ রায়, জগদীশ চন্দ্র সাহা, বসন্ত কুমার দাস, ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, হারাধন সরকার, ডা: কালিদাস বৈদ্য, শৈলেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, মলয়ভূষণ রায় এবং আদ্যেশ্বর হালদার। পরে আরও দুইজনকে গ্রহণ করা হয়, যথা— বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কার্তিক চন্দ্র ঠাকুর; কোষাধ্যক্ষ হন জগদীশ চন্দ্র সাহা (সূত্র: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কর্মবীর শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতারের ভূমিকা, শ্রীদেব জ্যোতি রায়। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ফিরে দেখা' শীর্ষক আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধ; ২৭.৮.২০১০ তারিখের এই আলোচনা চক্রটির আয়োজক ছিল 'Centre for Research in India Bangladesh Relations' আর 'MSMMC Education Trust; আলোচনাচক্রের স্থান ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ড. ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়াম'।)

২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৯ সামরিক আইন (মার্শাল ল) ঘোষণা করেন ইয়াহিয়া খান। ১ জানুয়ারি ১৯৭০ থেকে এই আইন বলবৎ হবার কথা বলা হল। বলা হল, অ-মুসলমান ভাবাদর্শ প্রসার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে। এর প্রতিবাদে চিত্তবাবু একটি দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠালেন ইয়াহিয়া খানকে। তাঁর বক্তব্য ছিল, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক জিন্নাহসাহেব এইরকম আদেশ দিতেন না। এরপর চিত্তরঞ্জন সুতারের পরামর্শে গড়া হয় 'জাতীয় মুক্তি দল'। তাঁর নির্দেশ ছিল জাতীয় মুক্তি দল এবারকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না— আওয়ামী লীগকে সমর্থন করবে। তাঁর পরামর্শ না শুনে দলের কেউ কেউ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। পরাস্ত হন। চিত্তরঞ্জন সুতার তখন আত্মগোপন করেছেন। লোকে জানল ভোলায় ঝড়-বন্যায় ত্রাণ সাহায্য করতে গেছেন। বিষয়টি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

।। ৪ ।।

এক অনাগত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার প্রস্তুতির কথা জানতেন মাত্র কয়েকজন অনুগামী। তাঁরা হলেন— বিপদভঞ্জন বিশ্বাস, নারায়ণ রায়চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শৈলেন্দ্র নাথ হালদার, নির্মলেন্দু দাস, ধীরেন্দ্রনাথ দাস। এঁরা যথাসম্ভব অর্থদান করলেন। সব স্থির হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর তাঁর 'নেতা' চিত্তরঞ্জন সুতারের গোপন পরামর্শে। ছ'মাস আগে থেকে স্থির করা হয় সব কিছু। ডা: কালিদাস বৈদ্য একটি গাড়ি যোগাড় করবেন তাতে করে যাবেন চিত্তবাবু। ঢাকা থেকে কুমিল্লা। গুপ্তচরদের চোখ এড়িয়ে কলকাতার পথ, গোয়ালন্দ-আড়িচাদহের পথ পরিহারের পরিকল্পনা ছিল। ডা: বৈদ্য কিন্তু গাড়ি যোগাড় করতে পারেননি। চিত্তরঞ্জনবাবু ঢাকা থেকে কুমিল্লা গেলেন উড়োজাহাজে। সঙ্গী ছিলেন বিপদভঞ্জন বিশ্বাস। আগে থেকে স্থির ছিল রিকশায় করে যাবেন শহরের এক জায়গায়, তারপর আসবেন আড়কাঠি, গাইড, 'বড়দা'। পায়ে হাঁটা পথ— সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলেন চিত্তবাবু। এরপর আগরতলা। সেখান থেকে দমদম বিমানবন্দর। তারপর দিল্লী। সেখানে ভারত সকারের একজন জয়েন্ট ডাইরেক্টর পদাধিকারী ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিস্তৃত কথা হয়। ফণীন্দ্রবাবু ছিলেন ওই সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির দায়িত্বে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল 'নাথবাবু'।

ঢাকার শ্যামবাজারের ফরাসডাঙ্গার একটি বাড়িতে থাকতেন শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সুতার। সঙ্গে বিপদবাবু আর শিশুপুত্র বাপী। বাড়িটি ব্রজমোহন দাসের। ব্রজমোহন কলকাতায় থাকতেন। এস্টেট দেখাশুনো করতেন মোহনবাবু। দোতলায় ছিল টেলিফোন। রাত্রে সেখানে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলতেন চিত্তবাবু। শুনে রাখতেন মঞ্জুশ্রীদেবী। চিত্তবাবু নিজেকে বলতেন 'ছানুদা'। যতীন্দ্রমোহন এভেনিউতে ব্রজমোহন দাসের বাড়িতে অস্থায়ীভাবে থাকতেন চিত্তরঞ্জন। ব্রজমোহন দাসের পুত্রের ডাক নাম ছিল ছানু। মঞ্জুশ্রীদেবী ফরাসডাঙ্গার কালীবাড়িতে যেতেন। তাঁর কাছ থেকে বার্তা শুনে নিতেন মুজিবুর রহমানের দূত। বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গোপনীয় — পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এব্যাপারে তাঁর উচ্ছ্বাস গোপন করেননি।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি নাগাদ শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে নতুন দিল্লী হয়ে কলকাতায় আসেন। একটি বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর পাশে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সেদিন আলোয় আলোময় রাজভবনে একটি ভোজসভায় আমন্ত্রণ পান চিত্তরঞ্জন ও মঞ্জুশ্রীদেবী। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন মঞ্জুশ্রীদেবী সম্পর্কে "The Pakistanis could easily hang this lady at least 10 times for the kind of sensitive messages she brought and conveyed in this turbulent times. Fro a house wife to take such risks is just indredible" (কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা, ১৯ নভেম্বর, ২০১১)। চুয়াত্তর বছর বয়সে মারা যান শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীদেবী। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে উক্ত পত্রিকা। শিরোনাম ছিল 'A patriot passes away' । সেই প্রতিবেদনে চিত্তরঞ্জন সুতার সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি কথা লেখা হয়, তাতে বোঝা যায় তাঁর সম্মান ঠিক কোন পর্যায়ের ছিল। লেখা হয়েছিল, "The death of Manjushree Sutar, 74, wife of Sheikh Mujibs personal emissary Chittaranjan Sutar who has been living in voluntary exile in the

city for over three decades, in Kolkata last week left a void"। এই বাক্যে চিত্তবাবুর ভূমিকা ও ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট। মঞ্জুশ্রীদেবীকে ওই প্রতিবেদনে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের সামরিক আক্রমণ (The final crack down) শুরু হবার আগে তিনি ছিলেন 'unsuspecting messenger carrying and conveying his personal messeges to Awami Leage Leaders' ।

কথায় কথায় আমরা খানিকটা এগিয়ে গেছি। মঞ্জুশ্রীদেবীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই কালক্রম ভঙ্গের প্রয়োজন পড়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বহুমাত্রিক। অনেক মানুষের জীবন-যৌবনের মহত্তম আবেগ ও উৎসর্গের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে। এই বহুমাত্রিক সংগ্রামের কোথাও মঞ্জুশ্রীদেবীকে রাখা না গেলে ধরতে হবে যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখেছেন, তাঁদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। সম্ভবত সাম্প্রদায়িকতার চশমা দিয়ে তারা এই মুক্তিযুদ্ধকে দেখতে চাইছেন। বাংলাদেশের সর্বস্তরের হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য মানুষ এই রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন— একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাংলাদেশের ঘোষিত রাষ্ট্রনীতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। এই মূল নীতি রক্ষিত হচ্ছে না। এই আশঙ্কায় সে দেশের মুষ্টিমেয় মানবাধিকার কর্মী দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করছেন। তাঁদের একটি পুস্তিকা হাতে এসেছে। শিরোনাম— 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা রাষ্ট্রদ্রোহিতার তুল্য অপরাধ'। (একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি— প্রকাশিত, ১৬ এপ্রিল, ২০১৪, ঢাকা-১২১২)। পুস্তিকাটি দেখলে বোঝা যায়, সেদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল নীতিকে অর্থহীন করে দেবার চক্রান্ত কেমন সুবিস্তৃত— ব্যাপক আর ভয়াবহ। এই পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিরাপদ কিনা সন্দেহ। এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট— মুজিবুর রহমানের সপরিবার নিহত হবার ঘটনার পর থেকে। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হয়ে সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি বাদ দিয়েছেন। ১৯৮৮ সালের ৭ জুন হোসেন মহম্মদ এরশাদ ইসলামকে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রধর্ম' বলে ঘোষণা করেন। এরপর স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল্যবোধ সেদেশে আশা করা যায় না। চিত্তরঞ্জন বা মঞ্জুশ্রীদের তাই সেদেশের ইতিহাসের পাদটীকাতেও স্থান পাওয়া অসম্ভব।

।।৫।।

সম্প্রতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ১৬ এপ্রিল ২০১০-এর একটি প্রবন্ধে ('স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও বাংলাদেশ সরকার'- প্রকাশ 'দৈনিক জনকণ্ঠ', ঢাকা) দেখিয়েছেন ১৯৬২ সাল নাগাদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। তবে কূটনৈতিক ও সামরিক কারণে শেখ সাহেবকে প্রত্যক্ষ কোনো আলোচনায় বসার জন্য ভারত সরকার প্রস্তুত ছিল না। কোনো সংযোগ সমস্যায় পড়ে মুজিবুর রহমান আখাউড়া সীমান্ত পার হন। কথা ছিল আগরতলা থেকে সরাসরি দিল্লী যাবেন। কিন্তু বি এস এফ তাঁকে বন্দী করে ফেরত পাঠায়। একজন কূটনীতিবিদ (অশোক রায়) শাহরিয়ার কবীরকে বলেছেন, 'ভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশে যদি স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়, ভারত সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা দেবে'। এরকম প্রতিশ্রুতি তিনি পেয়েছেন তদানীন্তন (১৯৬৪) ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কাছে (পশ্য : উক্ত প্রবন্ধ)। ২৬ এপ্রিল ২০১৪ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় শাহরিয়ার কবীরকে এনিয়ে প্রশ্ন করি। তাই যদি হবে তাহলে শেখসাহেবকে আখাউড়া থেকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর কারণ কী? উনি বলেছেন, ভারত সরকার চাননি মুজিবুর রহমানের মতো বড় মাপের নেতার সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা হোক। কোনো দেশই তা চাইবে না। জানাজানি হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিপক্ষে চক্রান্তের সংবাদ রটনা হওয়া সম্ভব। শাহরিয়ার কবীর চিত্তরঞ্জন সুতারের কাছে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। চিত্তবাবু তাঁকে বলেন, ১৯৬৯ সালে লন্ডনে ভারতীয় কূটনীতিকরা শেখ মুজিবুর রহমানকে বিষয়টি বোঝান। শেখ মুজিবও বিষয়টি বুঝেছিলেন জীবন দিয়ে। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। অভিযোগ, তিনি ভারতের সঙ্গে গোপনে দেশবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত। আগরতলায় তাঁকে স্বাগত জানালে বিষয়টি প্রমাণিত হত। ভারতীয় গোয়েন্দা দপ্তর এক্ষেত্রে অন্তত পাক গোয়েন্দাদের তুলনায় বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। এসব বিষয়ে আলোচনার মতো কাগুজে প্রমাণ নেই। সুতরাং বিস্তারে গিয়ে লাভ নেই। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুদ বা শাহরিয়ার কবীরের লেখা থেকে এটুকু বললাম। কারণ আমার মনে হয়েছে এঁরা দুজনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসটি নিরাসক্ত নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন।

চিত্তরঞ্জন সুতার 'জাতীয় মুক্তি দল' গঠনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকেও বিশেষ কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করেন। তিনি গোপনে কলকাতায় চলে আসেন। এব্যাপারে তথ্যাদি আগেই দিয়েছি। ব্যাপারটি ছিল অতিশয় গোপন। মঞ্জুশ্রীদেবী, বিপদভঞ্জনবাবুর মতো সামান্য কয়েকজনই জানতেন একথা। ঢাকায় একথা গোপন রাখার জন্য আগে থেকে লিখে রাখা কিছু পোস্টকার্ড বিপদভঞ্জনের কাছে ছিল। চিত্তবাবুর স্বাক্ষরিত ঐসব পোস্টকার্ড তিনি ঢাকার বাইরে থেকে ডাকবাক্সে ফেলার ব্যবস্থা করতেন। কলকাতা থেকে ঢাকা ফরাসডাঙ্গায় ফোন যেত— চিত্তবাবু তখন 'ছানু'দা। ব্রজমোহন দাসের পুত্র। কলকাতায় এসে

চিত্তবাবু ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। এস বি রায় — সত্যব্রত রায়। এসব কোনো রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনী নয়, বাস্তব। দেশের মুক্তি সংগ্রামে দৃঢ়ব্রত এক সাহসী ব্যক্তির জীবনোতিহাস।

১৯৭০ সালের ৩০ জানুয়ারি ভারতের একটি বিমান ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হয় রওয়ালপিণ্ডি। ভারত সরকারের উপর্যুপরি অনুরোধ ছিল ছিনতাইকারীদের ধরে ভারতকে ফেরত দেওয়া হোক— যাত্রীদের জীবন বাঁচাক পাক সরকার। ভারতের অনুরোধ উপেক্ষা করে পাক কর্তৃপক্ষ। বিস্ফোরণে বিমানটি ধ্বংস হয়। ভারত সরকার ক্ষুব্ধ হয়। চিত্তরঞ্জন সুতার তখন গুয়ারেখা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান পীযূষকান্তি সুতারের মাধ্যমে একটি ইংরেজি দৈনিকের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবর ও সঙ্কেতবার্তা পাঠান। বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান চাইলে উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে ভারত পাকিস্তানকে তার জল-স্থল-আকাশপথ ব্যবহার করতে দেবে না। মুজিব সেই সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারবেন। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে মঞ্জুশ্রী দেবী গেলেন। শেখসাহেব রাজি। খবর পেলেন চিত্তরঞ্জন। ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করল।

রীতিমত যুদ্ধ পরিস্থিতি। চিত্তবাবু এবার বার্তা পাঠালেন— আসতে হবে কলকাতায়। সঙ্গে বিশ্বস্ত দুটি তরুণী, যাদের হাতের লেখা ভালো, বাংলা ইংরেজি ভাষা মোটামুটি আয়ত্ত। মঞ্জুশ্রীদেবী দুই ছাত্রীকে যোগাড় করলেন— মঞ্জু আর দীপালি। যুক্তখোলা গ্রামের তারিণী মাঝির মেয়ে মঞ্জু আর ভান্ডারিয়া থানার ধাওয়া গ্রামের মেয়ে দীপালি। না, এরা কেউ আর স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাস করেননি। কলকাতার উপকণ্ঠে বিয়ে-থা হয়েছে। জনঅরণ্যে মিশে গেছেন। একটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের পুরস্কার? মুসলমান না হওয়ার দুর্ভাগ্য? মহাকাল বিচার করবে। আমরা চলে আসি আগের কথায়।

পাঁচ ফেব্রুয়ারি স্বরূপ কাঠীর ষাটশতলা থেকে মঞ্জুশ্রী, শিশুপুত্র বাপী, মঞ্জু, দীপালিদের সঙ্গে যাত্রা করলেন বিপদভঞ্জনবাবু। ঢাকা শ্যামবাজার ফরাসডাঙ্গায়। স্টিমার যোগে সেই জলযাত্রা। ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার লক্ষ্মীবাজরে ডা: কালিদাস বৈদ্যর বাড়ি যাওয়া সেরে বিমানযোগে কুমিল্লা। তারপর দীর্ঘ হাঁটাপথ। ফসল কাটা খড় ওঠা জমি। মঞ্জুশ্রীদেবীর শরীর ভালো ছিল না। রাত্রি এগারটা পর্যন্ত হেঁটে। অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে এলেন তাঁরা। বিরাট একটি বিলের ওপারে সোনামুড়া। সেখান থেকে ভাড়া করা গাড়িতে আগরতলা। বিবেকানন্দ হোটেলে উঠলেন সবাই। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ আগরতলা থেকে দমদম বিমানবন্দরে এলেন বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ।

ঐদিন কলকাতা শহরে অঘোষিত বন্ধের চেহারা। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত কুমার বসু আততায়ীর হাতে মারা গেছেন। কোনো গাড়ি চলাচল করছে না। রাত এগারোটায় বিমান কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের এনে নামালেন গণেশচন্দ্র এভিনিউয়ের শহর কার্যালয়ে। তারপর বহু কষ্টে যতীন্দ্রমোহন এভিনিউয়ের ব্রজমোহন দাসের বাড়ি। রাত তখন সাড়ে বারোটা।

বড়বাজারে 'ফণীদার দোকানে' গেলেন চিত্তবাবু। তার আগে সস্ত্রীক কালিঘাটে পুজো। বিপদভঞ্জনবাবু এই তথ্য দিয়েছেন। অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি (সূত্র : বিপদভঞ্জন বিশ্বাসের অপ্রকাশিত গ্রন্থ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্তরালে', পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রণের চেষ্টা করেন বিপদবাবুর পুত্র স্বপন কুমার বিশ্বাস। নমুনা সংশোধন করা হয় ১৯.১.২০০১ তারিখে। তবে কোনো অজ্ঞাত কারণে সে বই বের হয়নি। নমুনা সংশোধনের একটি প্রতিলিপি আমরা পেয়েছি স্বপনবাবুর মারফত। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই)। ওই দোকানটি কি ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের? মনে হয় না। সম্ভবত ফণীদার নির্দেশ দেওয়া কোনো দোকানের কথা বলেছেন বিপদভঞ্জন। যাই হোক, এরপর থেকে যতীন্দ্রমোহন এভেনিউয়ের বাড়ি ছেড়ে চিত্তরঞ্জনবাবুরা উঠলেন ২১ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা ২০-এর 'সানি ভিলা'-য়। তিনতলা বাড়ি। দিনটি খুব সম্ভব ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। প্রথমে চিত্তরঞ্জনবাবু, মঞ্জুশ্রীদেবী আর বিপদভঞ্জন। দুয়েকদিন পর মঞ্জু-বাপী-দীপালিদের আনা হয়। এই বাড়ি থেকে চিত্তরঞ্জন সাধ্যমতো পরিচালনা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

বাড়িটির বিবরণ দিয়েছেন কোনো কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামী। অধ্যাপক ইউসুফ আলির বর্ণনা— ''বাংলাদেশ থেকে আগত উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য এই বাড়িটি সংরক্ষিত ছিল। বাসাটির তিনতলায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বেতারযন্ত্র ছাড়াও যোগাযোগ স্থাপনের অন্যান্য উপকরণ সজ্জিত ছিল' (বাংলাদেশের স্বাধীন যুদ্ধ দলিলপত্র', ১৫শ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫, বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত, ৩৪৮ পৃঃ)। বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ তরুণ নেতা আবদুর রাজ্জাক ২.৬.১৯৮৯ তারিখে একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'কোলকাতার ২১, রাজেন্দ্র রোড, যেখানে চিত্তরঞ্জন সুতার বঙ্গবন্ধুর রিপ্রেজেনটিটিভ হিসেবে ছিলেন', (সূত্র : মাসুদুল হক, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' ও 'সি আই এ'; ওসমানিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা-১১০০, ১৯৯০, ১৭৪ পৃঃ)।

২ মার্চ বিপদভঞ্জনকে ঢাকায় যেতে বললেন চিত্তবাবু। শেখ মুজিবুর রহমানকে বার্তা দেবেন তিনি। টিকিট মিলল ৪ মার্চ। আগরতলা থেকে সেই পথপ্রদর্শক আড়কাঠি 'বড়দা'র মাধ্যমে সোনামুড়া ও কুমিল্লা হয়ে ঢাকায় এলেন বিপদবাবু। ৭ মার্চ সকাল সাতটায় ৩২ ধানমন্ডি, ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বিপদবাবু। সেখানে তখন জনসমুদ্র। বিশেষ করে ছাত্রনেতারা চঞ্চল। তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য দাবি জানাচ্ছেন। শেখ সাহেব এর মধ্যে বিপদবাবুকে আলাদা করে ডাকলেন। বললেন, 'কেমন আছেন মাই লিডার?' তারপর বললেন তাঁর মাথা কাজ করছে না। পরদিন দেখা করতে হবে। বিপদবাবু নানা রকম আশঙ্কার দোলায় দুলতে দুলতে ফিরলেন।

SANT VALVES PVT. LTD. SANT & SBM ISO-9001-2008 CERTIFIED

SANT

VALVES PVT. LTD.

AN ISO 9001-2008 CERTIFIED COMPANY

IBR APPROVED ISI MARKED

API 6D - 0806
API 600-0054
API 602-0004

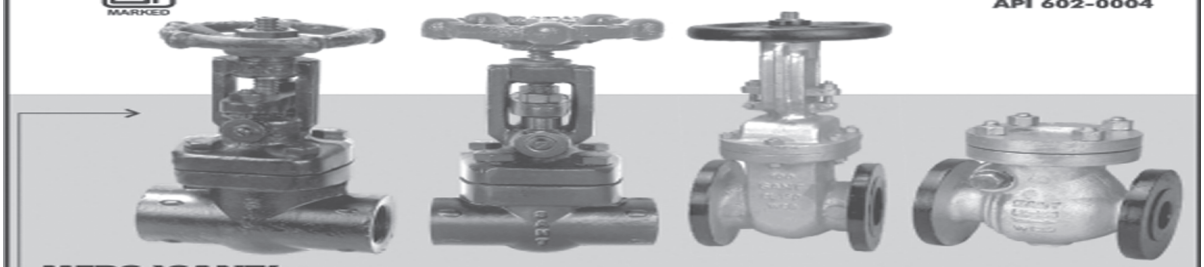

MFRS.'SANT'

IBR CERTIFIED
ISI MARKED

- BRONZE, CAST IRON, CAST STEEL AND FORGED STEEL BOILER MOUNTINGS.
- GM GATE / GLOBE / CHECK VLVES AND CI BALL VALVES, CAST IRON BUTTERFLY VALVES, SLUICE VALVES, REFLUX VALVES AND PULP VALVES.
- 'SBM' BRONZE INDUSTRIAL VALVES.

G.T. ROAD, BYE PASS, JALANDHAR - 144012 (PB.)
PH.: 0181-5084693-94-95, 2602522, 2603074
FAX : 0181-2603308/5062270
E-MAIL: svpl@jla.vsnl.net.in
Website : www.santvalves.com

GLORIOUS 31 YEARS

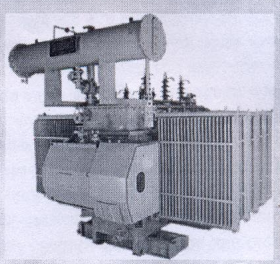

MANUFACTURERS & EXPORT OF :

Power & Distribution Transformers

Western Transformer & Equipment Pvt. Ltd.

Registered Office & Factory
Industrial Area, Mathura Road,
Bharatpur - 321 001 (Raj.)

PHONE : (05644) 238293
FAX NO. (05644) 238292
e-mail : western.transformers@ gmail.com

বিকেলে ঢাকার রেসকোর্সের সভায় বঙ্গবন্ধু তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা দিলেন। আঠারো মিনিটের সেই বক্তৃতায় ঘোষণা হল— 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বাঙালিদের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানালেন তিনি।

বিষয়টি চিত্তরঞ্জনবাবুর অপছন্দ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন আরও প্রস্তুতি নিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা হোক। বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের চাপে একাজ করলেন? নাকি এ ছিল তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত? খুব স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। যদি তিনি চিত্তবাবুর পরামর্শ মেনে আরও অপেক্ষা করতেন তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরতা কি কমত? মুজিব বাহিনী বা মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ কি বিলম্বিত করত বাংলাদেশের স্বাধীনতা? এসব প্রশ্নের মীমাংসা করা কঠিন। অসম্ভব।

৮ মার্চ ১৯৭১ বিপদভঞ্জন শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার সময় তিনি কি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে প্রস্তুত? বাঙালিরা তাদের সঙ্গে শুধু ইচ্ছাশক্তি আর আবেগের সাহায্যে লড়বে একথা ভাবা যায় না। বিপদবাবুর এসব প্রশ্নের জবাব সরাসরি না দিয়ে মুজিবুর রহমান বলেন, তিনি কলকাতায় ফিরে গিয়ে চল্লিশটি লাইট মেশিনগান, কিছু রাইফেল আর একটি ট্রান্সমিটারের ব্যবস্থা করুন জরুরি ভিত্তিতে। বিপদবাবু বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা আশ্রয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষের উপর পরম নির্ভরশীল। তাঁর বিশ্বাস তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না।

৯ মার্চ আর একবার ধানমন্ডির বাড়িতে গেলেন বিপদবাবু। 'সানিভিলা'র ঠিকানা লিখে দিলেন। মুজিবুর রহমান বললেন, ডা: আবু হেনাকে এই ঠিকানায় পাঠিয়েছেন (সূত্র : বিপদভঞ্জনের উক্ত অপ্রকাশিত গ্রন্থ)। তাঁর হাতে জরুরি ভিত্তিতে ট্রান্সমিটারটি পাঠাবার জন্য তাগিদ দিলেন। এ থেকে মনে হয়, মুজিবুর রহমান অন্য সূত্রেও 'সানি ভিলা'র সংবাদ জানতেন। ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা আরও কোনো উচ্চস্তর থেকে এই সংবাদ তাঁর কাছে গিয়ে থাকবে। যাই হোক, বিপদবাবু মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। মুজিবুর তাঁকে বলেন, তাঁর নাম এখন থেকে 'বরিশালের হামিদ'। এই নামে পরিচিত হতে হবে। আর অন্য ব্যাপারে তরুণ নেতা আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে পরামর্শ করতে। ঐদিন ঢাকার মগবাজারে একটি বাড়িতে রাজ্জাকের সঙ্গে বহুক্ষণ কথা হয়। বিপদবাবু জানলেন, রাজ্জাক জানেন না কোন দেশ কীভাবে সাহায্য করবে। হতে পারে শেখ মুজিব একথা একান্ত গোপন রেখেছিলেন।

১১ মার্চ তারিখে কলকাতায় ফিরে এলেন বিপদবাবু। মাত্র এই ক'টি অস্ত্রে কী করে মুক্তিযুদ্ধ করা সম্ভব? ভারতের সেনাবাহিনীর এক আধিকারিক নাকি শুনে সন্দেহ প্রকাশ করেন শেখ মুজিবুর হয়ত সত্যিকার সংগ্রাম চান না। তিনি হয়ত ইয়াহিয়ার সঙ্গে কোনো গোপন বোঝাপড়া করে রেখেছেন। খুব অমূলক সন্দেহ নয়। রাত আটটায় ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এলে চিত্তবাবু তাঁর কাছে শেখ মুজিবুরের বার্তা দিলেন। চাহিদা একটু বাড়িয়ে বললেন। অন্তত একটি ক্যান্টনমেন্ট দখলের মতো অস্ত্রশস্ত্র চান তাঁরা। বিপদবাবু বিশেষ করে ট্রান্সমিটারের কথা মনে করিয়ে দিলেন।

১৪ মার্চ ১৯৭১, সিরাজগঞ্জের বিধায়ক ডা: আবু হেনা এলেন 'সানি ভিলা'য়। তিনি ফিরে যান ১৯ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে। ট্রান্সমিটারটি সম্ভবত তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। এ থেকে মনে হতে পারে, মুজিবুর তাঁকে পাঠিয়েছেন, একথা হয়ত সত্যি নয়। সেক্ষেত্রে তিনি বিপদবাবুর আগেই 'সানি ভিলা'য় এসে হাজির হবেন।

।।৬।।

১৫ মার্চ, ১৯৭১ থেকে ঢাকায় রাজনৈতিক ঘটনার ঢেউ শুরু হল। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০, নির্বাচনে বিপুল ভাবে বিজয়ী শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করা ছাড়া ইয়াহিয়া খানের উপায় ছিল না। জুলফিকার আলি ভুট্টো এক্ষেত্রে তাঁর তীব্র আপত্তি জানিয়ে রেখেছিলেন। ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, সমগ্র পাকিস্তান সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ যখন ১৬০টি আসনে জয়ী হয়েছে, তখন তাদের নেতা শেখ মুজিবুরকে তিনি সরকার গড়তে ডাকবেন। স্থির হল ৩ মার্চ, ১৯৭১ জাতীয় সংসদ বসবে ঢাকায়। কিন্তু মানলেন না ভুট্টো। তিনি সংসদের অধিবেশন বয়কট করলেন। ঢাকায় ঘটল প্রবল প্রতিক্রিয়া— হরতাল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৭ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স বক্তৃতা। সেকথা লিখেছি। ইয়াহিয়া খান এলেন ঢাকায়। দশ দিন ধরে চলল আলোচনা। শুধু সময় কাটানো চলল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের যা বলা হতে থাকল, তা থেকে কিছুই বোঝা গেল না। ২৫ মার্চ তারিখে সহসা ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করলেন।

২৩ মার্চ বিপদভঞ্জনকে আর একবার পাঠালেন চিত্তবাবু। কিন্তু বেনাপোল সীমান্ত পার হয়ে বিপদবাবু যশোহর পর্যন্ত যেতে পারলেন। সর্বত্র সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে। বিপদবাবু ঢাকা যেতে পারলেন না। গেলেন বরিশালের ষাটশতলায়। এদিকে ২৫ মার্চ মুজিবুর রহমান বাড়িতে জমায়েত সব বড় নেতাদের ২১ রাজেন্দ্র রোডের ঠিকানা আর সত্যব্রত রায় তথা চিত্তরঞ্জন সুতারের কথা জানালেন। ঠিকানাটা মুখস্থ রাখতে হবে। লেখা থাকবে না কোথাও। ২৬ মার্চ রাত বারোটার পর শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। শুরু হল অত্যাচার— পৃথিবীর আর কোনো দেশের সৈন্যবাহিনী নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে এমন সর্বাত্মক যুদ্ধ করেনি। মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হলেন। বন্দী মুজিবুরকে নিয়ে যাওয়া হল পশ্চিম

পাকিস্তানে।

তোফায়েল আহমেদ ১৪ এপ্রিল ১৯৮৯ তারিখে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সত্তরের নির্বাচনের আগেও বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় গিয়ে আমরা 'সানি ভিলা'য় উঠি। একাত্তরের যুদ্ধ শুরু হবার আগেই এবাড়িটি নেওয়া ছিল। গণহত্যা শুরু হলে আমরা ভারতে গেলাম। ভারতে গিয়ে আমাদের আশ্রয়, যেটার ঠিকানা বঙ্গবন্ধু আমাদের মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ঠিকানায় শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং আমি গিয়ে উঠি' (সূত্র : মাসুদুল হক : উক্ত গ্রন্থ, ১৯১-৯৩ পৃঃ)। এই প্রতিনিধি অবশ্যই চিত্তরঞ্জন সুতার। বাংলাদেশের ইতিহাস যাঁকে শেখ মুজিবুর রহমানের 'প্রতিনিধি'র ভূমিকাটি অস্বীকার করার চেষ্টা করে চলেছে।

কিছুদিনের মধ্যে 'সানি ভিলা'য় এলেন আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা। তাদের মধ্যে ছিলেন— সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আবদুর রব সেরনিয়ামত (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভগ্নিপতি), ফজলুল হক মণি (বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে), আবদুর রাজ্জাক।

অনেকে এলেও আসেননি তাজউদ্দিন আহমদ। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ না আসা আর অন্য পথে, অন্য উপায়ে দিল্লিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে কিছু রহস্য প্রকাশ করেছেন চিত্তরঞ্জন সুতারের অনুগামী আর 'সানি ভিলা'য় উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। তাঁদের মনে হয়েছে এর আড়ালে কোনো গোপন ব্যাপার আছে।

নানা স্তরের প্রাপ্ত তথ্য বিচার করে মনে হয় 'সানি ভিলা' ছাড়াও ভারত সরকার হয়ত আরও কোনো কোনো উপায়ে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে। এব্যাপারে বি এস এফ তথা সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ভূমিকাও কিছু ছিল। ৫৭/৮, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাদের ব্যবস্থাপনায় নেওয়া ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন তদানীন্তন প্রবাসী সরকারের প্রধানরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন— সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি), তাজউদ্দিন আহমদ (প্রধানমন্ত্রী), মনসুর আলি, আমিরুল ইসলাম, খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ প্রমুখ (সূত্র : শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার; বিমল প্রামাণিকের নেওয়া সাক্ষাৎকারটির কথা পাচ্ছি বিমল প্রামাণিকের বই 'বাংলদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা'-তে। পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০১০। ৩৩ পৃঃ)। উক্ত শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় আই পি এস ছিলেন ভারত সরকার ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ রক্ষাকারী— লিয়াজোঁ অফিসার। এরপর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়

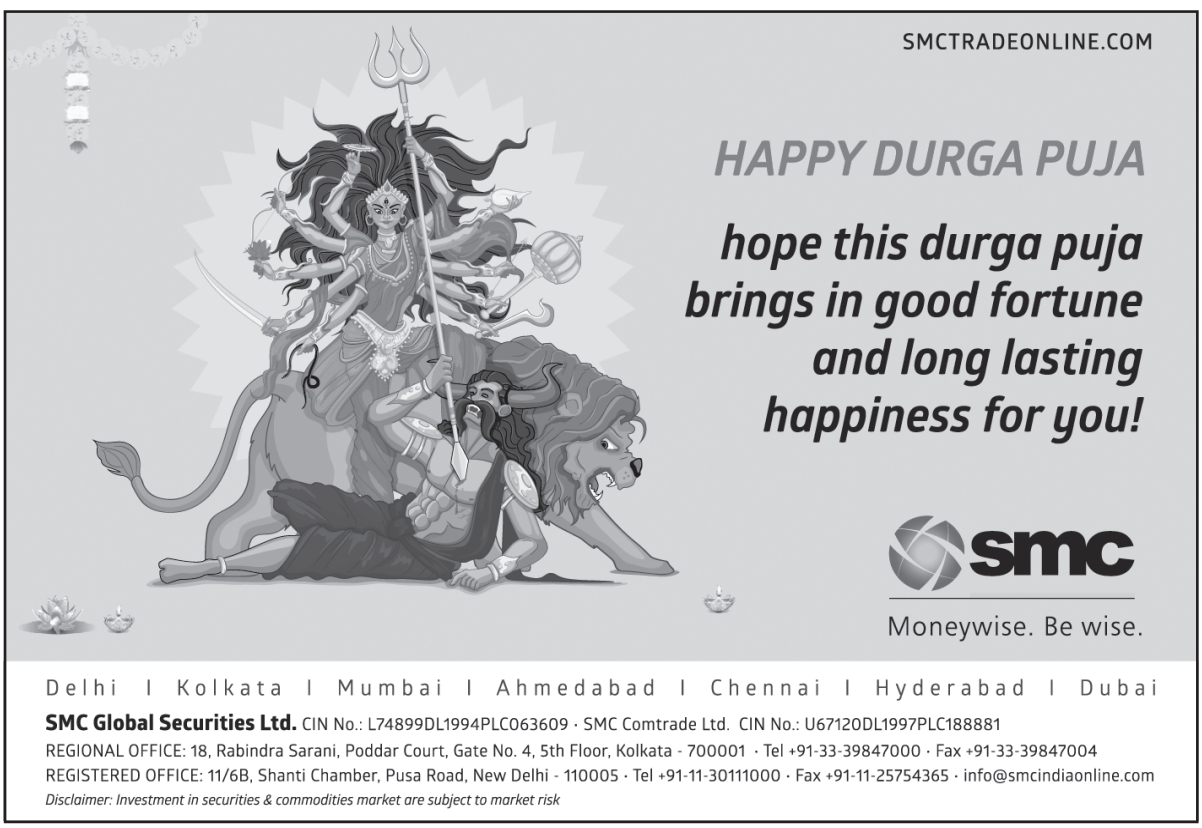

স্থানান্তরিত হয় ৮ থিয়েটার রোডের বাড়িতে। এখানেই গড়ে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশের বেতার কেন্দ্রের স্টুডিও। রেকর্ড করা হত বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে। তারপর তা নেওয়া হত ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে। সেখান থেকে হত সম্প্রচার (সূত্র : বিমল প্রামাণিক, ৩৩-৩৪ পৃঃ)। পরে এই বাড়িটিকেই 'মুজিবনগর' বলে বেতারে সম্প্রচার করা হত। আজ সেই বাড়িটি 'শ্রীঅরবিন্দ ভবন' বলে পরিচিত।

বোঝা যায়, ক্রমেই 'সানি ভিলা' গুরুত্ব হারায়। এখান থেকে পরিচালিত হতে থাকে মুজিব বাহিনীর গেরিলা যুদ্ধ। সে ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ১৭.৪.১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই সংবাদ কিছু আগেই (১০.৪.১৯৭১) বেতারে প্রচারিত হয়। শিলিগুড়ি বেতারে সম্প্রচারিত হয় তাজউদ্দিন আহমদের বক্তৃতা। দ্রুত সমস্ত বেতার কেন্দ্রে একই বক্তৃতা শোনানো হতে থাকে।

'সানি ভিলা'য় উপস্থিত হয়ে তাজউদ্দিন আহমদ সেখানকার আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের অনুমোদন গ্রহণের চেষ্টা করেন। ৮ এপ্রিল ১৯৭১ দিল্লী থেকে ফিরে ভবানীপুর এলাকার রাজেন্দ্র রোডের এক বাড়িতে কামারুজ্জামান সহ উপস্থিত আওয়ামী ও যুব নেতৃবৃন্দকে দিল্লী বৈঠকের ফলাফল অবহিত করেন।' 'ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনাকালে কোন বিবেচনা থেকে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও সরকার গঠনকে অবিবর্তনীয় বিষয় হিসেবে উপস্থিত করেন তাও ব্যাখ্যা করেন।' (সূত্র : মঈদুল হাসান, 'মূল ধারা একাত্তর', ইউনিভার্সিটি পাবলিশার্স লিঃ', ঢাকা ১৯৮৬, ১৬ পৃঃ)।

তাজউদ্দিন আহমদ-এর কথা অনুলিখন করেন সিমিন হোসেন রিমি। মার্চ ২০১২ সংখ্যা 'সাপ্তাহিক'-এ প্রকাশিত সেই স্মৃতিকথা 'একাত্তরের যাত্রা'য় উক্ত বক্তব্যের অনুরণন আছে। তদানীন্তন সীমা সুরক্ষা বল (বি এস এফ) প্রধান কে এফ রুস্তমজীর স্মৃতিকথায় এই বক্তব্যের সমর্থন আছে। (দেখুন : মুনতাসীর মামুনের উল্লেখিত প্রবন্ধ; 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা রাষ্ট্রদ্রোহিতাতুল্য অপরাধ'— পুস্তিকার অন্তর্গত, উল্লেখ করেছি। ১৭ পৃঃ)।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পূর্ব রণাঙ্গনে পাকিস্তানের পরাজয় হল। পূর্বাঞ্চলের সেনাপতি লেফটেনেন্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর পক্ষে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের সেনাপতি লেফটেনেন্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ৯৩ হাজার সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ করে ঢাকার রমনা ময়দানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন একটি ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে দ্বিতীয়বার হয়নি। আশ্চর্যের কথা, এই ইতিহাসও বাংলাদেশ সম্ভবমতো লঘু করে দেখাতে চাইছে। অকৃতজ্ঞতার এমন উদাহরণ খুব বেশি কোথাও মেলে না।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৩২ ধানমণ্ডির গৃহে সপরিবার নিহত হন। বাংলাদেশের জনক তাঁর নিজেরই সৈন্যদের দ্বারা নিহত হলেন। বিশ্ব ইতিহাসে অকৃতজ্ঞতার বহু নিদর্শনের একটি বলে ছেড়ে দেওয়া চলত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম, ওড়িশা, বিহারে ছড়িয়ে থাকা বিস্তৃত অঞ্চলে দেড় কোটির উপর আসা শরণার্থীদের আপন করে নিয়েছি আমরা। ভারতরাষ্ট্র যেভাবে সাহায্য করেছে এই নতুন রাষ্ট্র গঠনের বিভিন্ন পর্বে তা তারা ভুলে গেছেন! সবাই হয়ত নন, অনেকেই। সেসময় যারা বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছেন, মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের আগে যারা সেই দেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি, চীন বা সৌদি আরব, তাদের সঙ্গে এই নতুন বাংলাদেশীদের সম্পর্ক আশ্চর্য রকম গভীর। তাদের হয়ত মনে থাকে না, চীনের প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো এপ্রিল ১৯৭১ সালের বার্তাটির কথা। ইয়াহিয়া খানকে লেখা সেই বার্তাটি ছিল— "Your excellency may rest assured that should the Indian expansionists dare to launch aggression against Pakistan. The Chinese Government and people will, as always, support the Pakistan Government and people in their just struggle to safeguard state sovereiguty and national independence" । (সূত্র : 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র', ১৩শ খণ্ড, ১৯৮২, বাংলাদেশ সরকার, ৫৯৩ পৃঃ)।

চিত্তরঞ্জন সুতারকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে সম্ভব মতো আড়াল করা হয়েছে। সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, একটি বিচিত্র গবেষণা গ্রন্থের মন্তব্য : 'এমনকি কোনো কোনো মহল থেকে যখন এমন তথ্যও পাওয়া যায় যে, ১৯৭১-এর ভারত প্রবাসী অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ও দিল্লী সরকারের ঘনিষ্ঠতম লিঁয়াজো রক্ষাকারী কুখ্যাত চিত্তরঞ্জন সুতার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাত ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত ঢাকার বিশেষ এলাকায় অবস্থান করে রাত পৌনে বারোটায় তিনি বেনাপোলের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।' (সূত্র : রইসউদ্দিন আরিফ, 'রাজ্যনীতি, হত্যা ও বিভ্রান্ত রাজনীতি', ঢাকা, ১৯৯৭, ৪৯ পৃঃ)। লেখক একজন স্বঘোষিত চীনপন্থী। তাঁর এই আশ্চর্য গবেষণার যথার্থ উত্তর লিখেছেন প্রয়াত দেবজ্যোতি রায় তাঁর উল্লেখিত প্রবন্ধে।

২৯ জুলাই, ১৯৭৫ সালে চিত্তবাবু বাংলাদেশ থেকে চলে আসেন। তাঁর পাশপোর্ট নং B-047962 তারিখ ২৫.৭.১৯৭৪, ভিসা নং ২৫৮১৫, তারিখ ১৯.৭.১৯৭৫। এ নিয়ে আর বেশি কিছু লেখার রুচি হয় না। শুধু জানাই সেই পাশপোর্ট বাতিল করে দেয় মুজিব পরবর্তী বাংলাদেশ সরকার।

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

Phone : 0120-2820620
2820653
Fax : 2820653

LAW & MANAGE-MENT H O U S E LAW PUBLISHERS

R-15/5, Raj Nagar,
Ghaziabad - 201001
Post Box 1, (U.P.)

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

ইসলামে নারীর স্থান

আফজল খাঁ ও তার ৬৩ জন বিবির হৃদয়বিদারক উপাখ্যান

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারি

আজকের বিজাপুর, দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের একটি ছোট্ট শহর, যা পাঁচশো বছর আগে আদিল শাহ রাজবংশের (১৪৮৯-১৬৮৬) একদা রাজধানী ছিল। এর সৌন্দর্য, মনোহারিত্ব লুকিয়ে রয়েছে সেখানকার স্থাপত্যের মধ্যে। অতীত ইসলামিক রাজত্বের সাক্ষ্য বহনকারী এই সকল স্থাপত্য, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধের মধ্যে অন্যতম হল ষাট কবর যা কিনা মুসলিম নারীদের এক বিয়োগাত্মক ইতিহাসের স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে। আর এই ষাট কবরের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে এক হৃদয়বিদারক কাহিনী।

বিজাপুরের সুলতানি শাসনকালের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান প্রধান সেনাপতি বা 'সর্দার' ছিল আফজল খাঁ। আদিল শাহ রাজবংশের বহু যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পিছনে তার অবদান ছিল প্রচুর। ১৬৫৮ সালে বিজাপুরের দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ অক্লান্ত বীর, সমরকুশলী মারাঠা শাসক শিবাজীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েছিল। একদিকে দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের ক্রমাগত চাপ, অন্যদিকে শিবাজীর একের পর এক স্থান দখল— এই দুই প্রকার চাপের সম্মুখীন হয়ে আদিল শাহ্ তখন তার শত্রু শিবাজীর বাড়বাড়ন্ত স্তব্ধ করার জন্য তার সেনাপতিদের মধ্যে অন্যতম ও সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত আফজল খাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিল।

আফজল খাঁ যদিও খুব সাহসী ছিল, তবুও তার একটা দুর্বলতা ছিল। শাকুনতত্ত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাসজ্ঞাপন। শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার পূর্বে আফজল খাঁ একদল জ্যোতিষীর কাছে এই লড়াইয়ের সম্ভাব্য ফলাফল জানতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে হতবাক করে দিয়ে জ্যোতিষীরা যে ভবিষ্যদ্বাণী শোনালেন তা তার কাছে একপ্রকার ছিল অপ্রত্যাশিতই। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, মারাঠা সৈনিকদের হাতেই স্তব্ধ হবে এই নিষ্ঠুরের হৃদস্পন্দন, যা আফজলের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরানোর জন্য ছিল যথেষ্ট। তবে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কুপ্রভাব সর্বপ্রথম পড়ে আফজলের হারেমে

বিজাপুরে বিবিদের 'ষঠ্' কবর।

থাকা ৬৩ জন স্ত্রীর উপর। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীরা পুনরায় বিয়ে করতে পারে, এই আশঙ্কায় তাদের হত্যা করাই উপযুক্ত বলে মনে করল নররক্ত পিপাসু আফজল। কথিত আছে, তাদের একটি গভীর কুয়োয় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু অপর একটি মত হল সেই দুর্ভাগা নারীদের আফজল খাঁ নিজে হাতে হত্যা করেছিল। কিন্তু যাই হোক সেই জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রতিপন্ন করে ঐ নিষ্ঠুর, অত্যাচারী আফজল খাঁ প্রতাপগড়ে শিবাজীর হাতে প্রাণ দিয়েছিল।

বিজাপুর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে 'ষঠ্' কবরে সেই

শিবাজীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ আফজল খাঁ।

৬৩ জন দুর্ভাগা নারীর নিথর দেহ কবরে শায়িত রয়েছে যা সেই নৃশংস স্ত্রীহত্যার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। জোয়ারের শস্যক্ষেত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত এক একর জমির উপর বিস্তৃত গোরস্থান যেখানে আফজল খাঁ নিজের জীবদ্দশাতেই নিজের জন্য যে সমাধি বানিয়েছিল, অদৃষ্টের পরিহাসে সেই নিষ্ঠুর, ক্রূর সেনাপতির সমাধির পাশেই রয়েছে সেই ৬৩ জন দুর্ভাগা নারীর কবর, যাদের সে তার জীবিত থাকা অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও নিজের কাছে পেতে চেয়েছিল। বর্তমানে এই ক্ষেত্রটি 'এনসিয়েন্ট মনুমেন্টস্ এন্ড আর্কিওলজিক্যাল সাইটস্'-এর তরফ থেকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে ঘোষিত হয়েছে এবং রিমেইনস্ অ্যাক্ট ১৯৫৮-এর ধারা বলে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'-এর এক্তিয়ারভুক্ত হয়েছে। ছায়াঘেরা নির্জন এই স্থানটিতে বহু মানুষই বিশ্রামের জন্য আসে এবং সমাধিক্ষেত্রের পাথরগুলির ওপর আঁকিবুকি কেটে নিজেদের উপস্থিতির স্বাক্ষর রেখে যায়। যার ফলে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী পাথরগুলি আজ মলিনতাপ্রাপ্ত, জৌলুসহীন। এই স্থানের কাছেই বসবাসকারী এক ৬৫ বছর বয়স্কা মুসলমান মহিলা আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন যে এই সকল কবর থেকে উঠে আসা হৃদয়বিদারী কান্নার কথা সবার জানা প্রয়োজন।

আফজল খাঁর মৃত্যু কীভাবে ঘটেছিল?

আফজল খাঁ অবগত ছিল যে শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গে অবস্থান করছেন। তাই সে পরিকল্পনা করল কি উপায়ে শিবাজীকে প্রলুব্ধ করে দাক্ষিণাত্যের উন্মুক্ত মালভূমিতে নামিয়ে আনা যায় যাতে অতি সহজেই শিবাজীর সেনাবাহিনীকে সে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হতে পারে। আর আফজলের শক্তি নিহিত ছিল তার বৃহৎ সৈন্যদলের মধ্যে। তৎকালীন সময়ে তার অধীনে ছিল ১২ হাজার সৈন্য-সহ কামান, হস্তীবাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, উষ্ট্রবাহিনী, যা শিবাজীর নবগঠিত সেনাদের তুলনামূলকভাবে ছোট 'স্বরাজ্য' বাহিনীকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। শিবাজীর লোকবল যে নগণ্য, সেই ব্যাপারে আফজল খাঁ খুব ভালোভাবেই অবগত ছিল আর সেই কারণেই সে পরাক্রমশালী মারাঠা বীর শিবাজীকে উন্মুক্ত প্রান্তরের সমরে আনার জন্য সচেষ্ট ছিল, যাতে শীঘ্রই শিবাজীকে শেষ করে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে।

বাঘ নখের দ্বারা শিবাজীর আফজল খাঁকে হত্যা

অন্যদিকে শিবাজীর লোকেরা ছিল গেরিলা যুদ্ধে দক্ষ, যারা অতর্কিতে শত্রুপক্ষের উপর হানা দিয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে অতি শীঘ্র প্রস্থানে সক্ষম। আর তাই শিবাজী চেষ্টা করেছিলেন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হওয়ার।

শিবাজীকে দুর্গ থেকে নেমে আসতে বাধ্য করার জন্য ধূর্ত আফজল খাঁ এক ফন্দি আঁটল। সে একের পর এক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেত লাগল এবং অবশেষে হাত বাড়ালো ঐতিহ্যবাহী মর্যাদাপূর্ণ ভবানীমাতার মন্দিরের দিকে। আফজলের ধারণা ছিল শিবাজী ধর্মপ্রাণ হিন্দু। তাই হিন্দুদের দেবদেবীর প্রতি ঘটা এইকম অপমান সহ্য করতে না পেরে সম্মুখ সমরে আসবেন। কিন্তু শিবাজী আফজলের এই ফাঁদে পা দিলেন না।

শিবাজীকে দুর্গ থেকে নামিয়ে আনার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় অন্যোন্যপায় হয়ে আফজল খাঁ নিজে সাতারার নিকটবর্তী প্রতাপগড় দুর্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই স্থানটি ছিল শিবাজীর পদাতিক বাহিনীর কাছে কৌশলগতভাবে এক সুবিধাজনক স্থান। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে প্রতাপগড় দুর্গের পাদদেশে একটি বড় তাঁবু খাটানো হল। পূর্ব কথামতো উভয়পক্ষই নিরস্ত্র অবস্থায় সাক্ষাতের জন্য রাজি হলো। কিন্তু স্থির হল প্রত্যেক পক্ষই তাদের সঙ্গে দশজন ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আনবে, যারা তির ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থান করবে।

উভয়পক্ষই বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তৈরিই ছিল। শিবাজীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আফজল একটি ছোট্ট ধারালো ছুরিকা তার পোশাকের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। অন্যদিকে শিবাজী বুঝতে পেরেছিলেন এই সাক্ষাৎ কোনও সাদামাটা সাক্ষাৎ নয়, হয়তো তাঁকে হত্যার এক গভীর ষড়যন্ত্র। তাই তিনি তাঁর নিজের সমস্ত রকম সুরক্ষার ব্যবস্থা করলেন— পোশাকের তলায় বর্ম পরলেন এবং হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে লুকিয়ে রাখলেন 'বাঘনখ' নামক এক সাংঘাতিক ধারালো অস্ত্র।

অবশেষে এল সেই চরম মুহূর্ত, যখন হিন্দুবীর শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল চরম হিন্দুবিদ্বেষী অত্যাচারী ধূর্ত বিজাপুর

উগাণ্ডার স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি ইদি আমিন।

সেনাপতি আফজল খাঁর। শিবাজীকে হত্যার ছক তো আগেই কষে রেখেছিল আফজল, আর এইবার শিবাজীকে দেখেই তাঁকে সম্ভাষণ করে জড়িয়ে ধরে তার লুক্কায়িত ছুরিকার দ্বারা শিবাজীর পিঠে আঘাত করে। কিন্তু তাঁর পোশাকের তলায় বর্ম থাকায় তিনি রক্ষা পেয়ে যান এবং পরমুহূর্তেই মুষ্টি উন্মুক্ত করে বাঘনখ নিয়ে আফজল খাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই তীক্ষ্ণ বাঘনখের সাহায্যে তাঁর নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন। এমতাবস্থায় কোনোমতে নির্গমনশীল অন্ত্র নিয়ে আফজল তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে যেনতেনপ্রকারেণ নিজেকে পালকির উপর নিক্ষেপ করেই রক্তাক্ত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। কিন্তু পাহাড়ের ঢালে নামার ক্ষণিকের মধ্যেই শিবাজীর দেহরক্ষীদের দ্বারা আফজলের শিরশ্চেদ ঘটে। অপরদিকে আফজল খাঁর দেহরক্ষীদের আক্রমণের কবল থেকে শম্ভাজি কাওয়াজি ও জিভা মহল শিবাজীকে রক্ষার্থে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এক্ষেত্রে একটি অন্যমত প্রচলিত আছে। সাক্ষাতের জন্য শিবাজী যখন তাঁবুতে এসে পৌঁছলেন, তখন সেই স্থলে আফজলের দেহরক্ষী সৈয়দকে দেখে তিনি আফজলকে তার দেহরক্ষীকে তাঁবুর বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চুক্তি অনুযায়ী উভয়ের সাক্ষাতের সময় অন্য কোনো ব্যক্তির উপস্থিতির অনুমোদন ছিল না। এরপর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যখন শিবাজী তাঁর বাঘনখের আঘাতে আফজলের উদর ছিন্নভিন্ন করেছিলেন ঠিক সেই সময়েই সৈয়দ খাঁ তাঁবুতে প্রবেশ করে ও তার সেনাপতিকে বাঁচানোর জন্য ছুটে যায়। ক্রোধে উন্মত্ত সৈয়দ খাঁ আফজলের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শিবাজীকে হত্যা করতে যখন উদ্যত হয়, ঠিক সেই সময়েই শিবাজীর দেহরক্ষী জিভা মহল সৈয়দকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেন।

শিবাজী দুর্গের দিকে ধাবিত হলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেনাপতিরা রণশিঙ্গা বাজানোর আদেশ দিলেন। অরণ্যাবৃত গভীর উপত্যকায় বিশেষ রণকৌশলে স্থিত সেনাবাহিনীর প্রতি এটি ছিল একটি পূর্বনির্ধারিত ইঙ্গিত। নেতাজী পালকর-সহ শিবাজীর সকল সেনাপ্রধানদের সম্মিলিত ও সমকালিক আকস্মিক আক্রমণের ফলে আফজল খাঁর সৈন্যরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। কিন্তু খাণ্ডেজী খোপাড়ে-সহ কয়েকজন মারাঠা সেনাপ্রধানের সাহায্যে আফজল খাঁর পুত্র পালাতে সফল হয়। মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এটি ছিল আর একটি সাংঘাতিক ভুল।

এরপর শিবাজী আফজল খাঁর ছিন্ন মুণ্ডু রায়গড়ে তাঁর মা জিজাবাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কারণ রাজমাতা চেয়েছিলেন আফজল খাঁর অধীনে বন্দী থাকা অবস্থায় শিবাজীর পিতা শাহজী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভাজীকে যে নরপিশাচ হত্যা করেছিল, সেই নরপিশাচ আফজলকে হত্যার মধ্যে দিয়ে তাঁর বীরপুত্র শিবাজী তাঁর স্বামী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ নিল।

অটোমান সুলতান ইব্রাহিম তার ২৮০ জন স্ত্রীকে ডুবিয়ে মেরেছিল

১৬৪০ থেকে ১৬৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিল প্রথম ইব্রাহিম। সে সুলতান প্রথম আহমেদের পুত্র ছিল। তার দুর্বল মানসিক স্থিতির জন্য তাকে উন্মাদ ইব্রাহিম (তুর্কী ভাষায় দেলী ইব্রাহিম) নামে অভিহিত করা হত। কিন্তু এই উন্মাদ ইব্রাহিমই তার ভাই চতুর্থ মুরাদের পর ১৬৪০ সালে সিংহাসনে আরোহণপূর্বক এক অন্যতম বিখ্যাত অটোমান সুলতান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুরাদ ইব্রাহিম ব্যাতীত তার অপর তিন ভাইকে হত্যার আদেশ দিয়েছিল। সে ইব্রাহিমকে অব্যাহতি দিয়েছিল কারণ সে ভেবেছিল যে তার উন্মাদ ভাই ইব্রাহিম তার ক্ষমতা ভোগের ক্ষেত্রে কোনো বিপদ হয়ে দাঁড়াবে না।

ইব্রাহিমের স্থূল মহিলাদের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। সে তার প্রতিনিধিদের যতটা সম্ভব মোটা মহিলার খোঁজ করতে বলেছিল। জর্জিয়া এবং আর্মেনিয়াতে এমনই এক মহিলার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, যার ওজন ছিল ৩৩০ পাউন্ড (১৩৭.৪ কেজি)। ইব্রাহিম এই মহিলাকে ভালোবেসে 'শেকর পারে' অর্থাৎ চিনির গোলা বলে সম্ভাষণ করত। সে এই স্থূল মহিলার প্রতি এতটাই সন্তুষ্ট ছিল যে তাকে সরকারিভাবে উচ্চ বেতন দিতেন এবং অভিযোগ করা হয় যে, সরকারি ক্ষমতাও ঐ মহিলার উপরেই বকলমে নিয়োজিত ছিল। সেই সময় তার হারেমে ২৮০ জন স্ত্রী

এবং বহু উপপত্নী ছিল। একদিন একটি গুজব রটে যায় যে, তার হারেমের উপপত্নীদের সঙ্গে কোনো একটি পুরুষের সম্পর্ক আছে এবং এই রটনা তার কর্ণগহ্বরে প্রবেশ করা মাত্রই সে তাদের সকলকে হত্যা করবে বলে মনস্থির করে এবং অবশেষে সেই হারেমের ২৮০ জন সদস্যের সকলকে বস্‌পোরাস্ সাগরে হত্যা করে।

এই নিরীহ নারীদের হত্যার ফল তাকে ইহজীবনেই ভোগ করে যেতে হয়েছিল। অবশেষে নাতি মুফ্‌তির দ্বারা ইব্রাহিম সিংহাসনচ্যুত হয়। কথিত আছে যে, ইব্রাহিমের হারেমের ২৮০ জন সদস্যার হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ নাতি মুফতি এই ঘটনা ঘটিয়েছিল, কিন্তু ইব্রাহিমের সেই গণহত্যার মধ্য থেকে তার দু'জন উপপত্নী বেঁচে গিয়েছিল এবং তার কৃতকর্মের পরিণতিস্বরূপ ইস্তাম্বুলে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল।

উগান্ডার আইদি আমিন

১৯৭১-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত উগান্ডার শাসন ক্ষমতার শীর্ষে থাকা রাষ্ট্রপতি তথা সামরিক স্বৈরাচারী যে মানুষটি ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে মিলটন ওবেটেকে ক্ষমতাচ্যুত করে শাসন ক্ষমতার মসনদ দখল করে, সে হল আমিন দাদা গুমি, সাধারণত সে আইদি আমিন নামেই সমধিক পরিচিত। তার শাসনকালে চিহ্নিত হয়ে আছে মানবাধিকার লঙ্ঘন, রাজনৈতিক দমন ও উৎপীড়ন, জাতিগত নির্যাতন, অবিধানতান্ত্রিক হত্যা, উগান্ডা থেকে এশিয়ার অধিবাসীদের বিতাড়নের মধ্য দিয়ে। ক্ষমতার মোহে অন্ধ, মনুষ্যত্ব, বিবেকবোধ বর্জিত আইদি আমিনের নিষ্ঠুর শাসনকালে যে কত মানুষের রক্তে ভেজা, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না, তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণকারী ও মানবাধিকার কর্মীদের দলের হিসাবে এই নরহত্যা ১০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে।

১৯৭৯ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর আমিন লিবিয়ায় পালিয়ে যায় এবং সবশেষে ১৯৮১ সালে সৌদি আরবে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে ২০০৩ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই বাকি জীবনটা অতিবাহিত করে।

আইদি আমিন

সরকারিভাবে আইদি আমিনের পাঁচজন স্ত্রী ছিল (যদিও অনেকে মনে করেন যে প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যাটা আরও বেশি)। তবে তাকে অমান্য করার শাস্তি কি হতে পারে, তার নিদর্শন সন্তানদের সামনে তুলে ধরার জন্য ওই পাঁচজন স্ত্রীর মধ্য থেকে একজনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে হত্যা করে। আরও বলা হয়ে থাকে যে, তার হারেমে ৩৪ জন উপপত্নী সহ অনেক রক্ষিতাও ছিল। অনেকে মনে করে থাকেন, যে আমিন সিফিলিস রোগে আক্রান্ত ছিল, যা তারই হারেমের কোনো এক নারীর সঙ্গে সংসর্গের ফলে তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল। তার কুড়িটিরও বেশি সন্তান ছিল।

যে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল, আইদি আমিন সর্বদা হারেমে তারুণ্য ও যৌবনরসে পরিপূর্ণ যুবতী স্ত্রী বা উপপত্নী বা রক্ষিতাদের রাখত এবং সেই নারীদের মধ্যে কেউ কোনো কারণে নিন্দিত হলে বা বার্ধক্যের ভারে জীর্ণ হলে তাদের নির্দিষ্ট সময় পর পর হারেম থেকে নির্বাসিত করত। আমাদের মতো যারা প্রবীণ ব্যক্তি আছেন তাঁরা ১৯৭০-এর দশকে খবরের কাগজে এইরকম হৃদয়বিদারক সংবাদগুলি পড়ে চমকে উঠতেন যে কেমন করে নিরাপত্তাকর্মীরা সকল দর্শকদের সামনে দিয়ে বিলাপকারী নিপীড়িতদের হত্যাস্থলে নিয়ে যেত।

কিন্তু এইরকম একটি নিষ্ঠুর হত্যাকারীকে সৌদি আরবের সরকার রাজনৈতিক প্রশ্রয় দিয়ে সারা বিশ্বকে এইটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আইদি আমিন কোনো গুরুতর অপরাধ করেনি। অথবা তার স্ত্রীদের হত্যার মাধ্যমে ইসলামকে অপমানিত করেনি। তৎকালীন সময়ের কিছু সাংবাদিক অভিযোগ করেন যে আইদি আমিন একজন নরমাংসখাদক ছিল যে তার স্ত্রীদের হত্যা করে তাদের মাংসের স্বাদ গ্রহণ করত।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ইসলামে নারীর স্থান গৃহপালিত পশুর থেকেও অধম। নবী মহম্মদের সময়ে আরবে এমন নিয়মও প্রচলিত ছিল যে, একজন আরব দেশীয় পুরুষ তার স্ত্রীকে একটা ঘরে আবদ্ধ রেখে বেঁচে থাকার জন্য খাবার ও পানীয় জল না দিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারত। 'আরব হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০২'-এর সম্পাদকগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম জগতে নারীদের কখনোই একজন সম্পূর্ণ নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয় না, যার ফলস্বরূপ তাদের উপর নিপীড়ন ইসলাম জগতের অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আফজল খাঁ তার ৬৩ জন স্ত্রীকে হত্যা করেছিল এই শঙ্কা থেকে যে তার মৃত্যুর পর হয়তো তার স্ত্রীরা পুনরায় বিয়ে করতে পারে। তাই এটা সহ্য করতে পারেনি যে তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের অন্য পুরুষ ভোগ করুক। আর এই কারণ থেকেই নবী মহম্মদ তার হারেমের স্ত্রীদের পুনর্বিবাহ নিষেধ করে দিয়েছিল।

ধাইমা

গোপালকৃষ্ণ রায়

তুলসীরাণী হালদার কাকভোরে বিষ্ণুলোকে যাত্রা করেছে। আজ আর তার সূর্য প্রণাম করা হল না।

রাতের শেষ প্রহরে বুকটা কেমন ভারী হয়ে উঠেছিল। তার মনে হচ্ছিল, সে আর নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। কে যেন গলা চেপে ধরে আছে। কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করেছিল তুলসী। কথার পরিবর্তে গলা দিয়ে কেমন যেন একটা অঃ অঃ শব্দ বেরোচ্ছিল। কিছু একটা বলতে চাইছিল সে। তার ধর্মপুত্রী কানের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিছু বলবে, ধাইমা?

কয়েকবার তুলসীর ঠোঁট নড়ে উঠেছিল, কিন্তু স্পষ্ট কোনো শব্দ বেরোয়নি। তুলসীর দু-চোখের কোল বেয়ে দু'ফোঁটা জল চিবুকে একটা রেখা টেনে দিয়েছিল। শঙ্করী শুনেছে, একেই নাকি বলে মায়াজল। আপনজনের কাছ থেকে চিরবিদায় নেবার আগে মায়াজল নির্গত হয়।

শঙ্করীর একবার মনে হয়েছিল, ধাইমার মুখ দিয়ে 'সূর্য' শব্দটি বেরিয়েছিল। তাহলে কী মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধাইমা সম্ভবত সূর্যস্তব করতে চেয়েছিল! বছরখানের হল সেনবাড়ির পুকুরে বাঁধানো ঘাটে বসে সূর্যোদয় দেখতো। আর বিড়বিড় করে সূর্যস্তব আওড়াতো।

পূব আকাশে যখন উদীয়মান সূর্যের সাতরঙা রশ্মি ছড়িয়ে পড়তো, সেই সময় তুলসী স্তব শুরু করতো। 'জবা কুসুম....'

এই সূর্যস্তব তাকে শিখিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা মন্দিরের গণকঠাকুর বিনোদ আচার্য। গালে সফেদ দাড়ি, মাথাভরা সাদা কোঁকড়ানো চুল চুড়ো বাঁধা। পায়ে বোল দেওয়া খড়ম। উদোম গা। খুব শীত পড়লে একটা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে রাখতেন।

হালদারপাড়া আর নোয়াপাড়া মুখোমুখি। দু'পাড়ার মাঝে একটা খাল। সেই লোকাল বোর্ডের আমলে কাটা হয়েছিল। নদীর মুখ থেকে পাঁচ মাইল লম্বা খালটা কুমীরডাঙ্গার বিলে মিশেছে। আগে খাল দিয়ে বারোমাস নৌকো চলতো।

একবার বন্যার সময় নদী থেকে একটা বিশাল ঘড়িয়াল ঝড় বৃষ্টির রাতে কুমীরডাঙ্গার বিলে ঢুকে পড়েছিল। কুমীরডাঙ্গার কালো জলে বেশিদিন থাকতে পারেনি। একদিন সবাই দেখল, ঘড়িয়ালটি ফুলে ফেঁপে বিলের জলে ভাসছে। বিলে থিতানো জলে, সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি।

আরও অদ্ভুত কাণ্ড! আজও সেই দৃশ্যটা কেউ ভুলতে পারেনি। জনা পঞ্চাশেক লোক মৃত ঘড়িয়ালটাকে টেনে ডাঙ্গায় তুলেছিল। ভেবেছিল বিলের ধারে রাখলে শকুনে শেয়ালে খেয়ে নেবে। সবাই অবাক হয়ে দেখল, খাওয়া তো দূরের কথা, একটা শকুনও তার ধারেকাছে গেল না। তারপর চামারপাড়ার ঋষি চর্মকার ঘড়িয়ালের চামড়াটা ছাড়িয়ে বিলের ধারেই কবর দিয়েছিল।

বিনোদ আচার্য বলতেন, আমি তোমার স্বামী গণেশের চেয়ে দু'বছরের বড়। আমার এখন দুই কম পঞ্চাশ।

তুলসী বলতো, তা তো হবেই। আপনার বড় ছেলের বয়সই তো হল প্রায় চব্বিশ। আমার হাতেই তো ওর জন্ম। সেদিন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। মনে নেই আপনার? আপনি বৃষ্টিভেজা রাতে আমাকে নিয়ে গেলেন। কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! কী বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। মেঘের কী গর্জন! বৃষ্টির শব্দ মেঘের গর্জন আর আপনার ছেলের কান্না মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। বিনোদ বলেছিলেন, তোমার সে রাতের উপকার আমার আজীবন মনে থাকবে।

স্মৃতি আর এগোয় না। মায়াজল চিবুকে গড়িয়ে পড়তেই শঙ্করী হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

— ধাইমা! শঙ্করীর চিৎকার হালদারপাড়ার খাল পেরিয়ে নদীর ধারে কৈবর্তপাড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। শঙ্করীর চিৎকার শুনে প্রথমে ছুটে এসেছিলেন রায়বাড়ির শশাঙ্ক রায়। মোটা বেতের লাঠি হতে নিয়ে পুকুরের পশ্চিমপাড় দিয়ে মিনিট কয়েকের মধ্যে তুলসীর উঠোনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। শঙ্করী তখন গলা ছেড়ে কাঁদছিল। তার পাঁচ বছরের মেয়েটা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করেন, কী হল শঙ্করী?

শঙ্করীর কান্না দ্বিগুণ বেড়ে যায়। শশাঙ্ক বুঝতে পারেন, ধাইমা তুলসী আর নেই। সে বিষ্ণুলোকে যাত্রা করেছে।

একজনের মুখে খবর শুনে পুটু ডাক্তার বাজারের ডিসপেনসারি খোলা রেখেই সাইকেল চেপে সোজা চলে এসেছেন তুলসী হালদারের বাড়ি।

পুটু ডাক্তারকে দেখে শশাঙ্ক বলেন, দেখ তো ডাক্তার, তুলসীর কি হল?

তুলসীর গায়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠেন পুটু ডাক্তার। শশাঙ্ক চোখ বড় করে পুটু ডাক্তারের দিকে তাকাল।

পুটু ডাক্তার হাত দুটো শূন্যে তুলে বলেন, ধাইমা নেই। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

কথা শেষ করতে পারেন না পুটু ডাক্তার। তাঁর গলা বুজে আসে। চোখ ভিজে ওঠার আগেই সাইকেলে বেরিয়ে যান। ধরা গলায় বলেন, প্রয়োজনে খবর দিও। বাঁশঝাড়ের শোঁ শোঁ শব্দে পুটু ডাক্তারের সব কথা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

হালদারপাড়া, নোয়াপাড়া ও কাছারিপাড়ার মানুষের ভিড়ে তুলসীর উঠোন ভরে যায়।

তুলসীর ঘরের চারদিকে অনেক গাছ। ফলের গাছ ছাড়াও অনেক রকম ওষধি গাছে ভরা তার বাড়ি। অক্ষয় কবিরাজ মাঝে মাঝে এসে লতাপাতা তুলে নিয়ে যায়।

তুলসীর উঠোন শেষে গোঁসাইদের বাড়ির সীমানা শুরু। একটা চারচালা টিনের ঘর ছাড়া গোঁসাইদের ভিটেতে আর কিছু নেই। গোঁসাইরা বহুদিন আগেই নবদ্বীপ চলে গেছে। গণেশ হালদারের উপর দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত গোঁসাইদের ভিটের দায় দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল তুলসী।

গোপেশ্বর গোস্বামী বাড়িটার দায়দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল তুলসী। গোপেশ্বর গোস্বামী নবদ্বীপ থেকে বাড়িটির দায়দায়িত্ব সব কিছুই লিখিতভাবে তুলসীকে অর্পণ করেছিলেন। সেই অর্পণপত্রের শেষে লাল কালি দিয়ে লেখা ছিল 'আমার ও আমার স্ত্রী কুমুদিনীর মৃত্যুর পর গোটা ভিটেটার মালিকানা শ্রীমতী তুলসীরাণী হালদারের উপর বর্তাবে।'

ইচ্ছাপত্র পড়ে শঙ্করবাবুর মনে হয়েছিল, গোপেশ্বর গোস্বামী তুলসীর ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছেন। সেই পুরনো ঘটনা চোখ বুজলেই শশাঙ্কর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

প্রসব ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন কুমুদিনী। সন্ধ্যা থেকেই প্রসব করাবার চেষ্টা করছিল তুলসী। সন্তানটি জরায়ুর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। কোনো ধাইমার পক্ষে সেই কঠিন কাজ করা সম্ভব ছিল না। এদিকে কুমুদিনী ক্রমাগত নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল। তার গোঙানি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছিল। তুলসীর ছোট বোন বাশুলিও তার সঙ্গে ছিল।

উদ্বিগ্ন গোপেশ্বর গোস্বামী পাগলের মতো ঘরবার করছিলেন। উঠোনের আঁতুড়ঘরের ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে এসে তুলসী বলেছিল, কর্তা!

গোপেশ্বরের কানে তুলসীর ডাক পৌঁছয় না। তিনি হাত জোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

— গোঁসাই বাবা!

— হ্যাঁ, কী হল?

— কর্তা, কাছারিপাড়া থেকে এক ছুটে ক্ষিতীশ ডাক্তারকে নিয়ে আসুন। দেরি করবেন না।

ক্ষিতীশ ডাক্তার এসে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়েছিলেন। কুমুদিনী বেঁচে গেলেও তার মাতৃসম্ভাবনা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্ষিতীশ ডাক্তার বলেছিলেন, তুলসী না থাকলে আপনার স্ত্রীকে বাঁচানো যেত না।

ক্ষিতীশ ডাক্তার তুলসীর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, ঈশ্বর তোর মঙ্গল করবেন। তোর এই উপকার গোপেশ্বর কোনোদিনই ভুলতে পারবে না।

গোপেশ্বর বা কুমুদিনী এই মুহূর্তে কেউ নেই। বিঘাখানেক জমির উপর কোনো ঘরটর তোলেনি তুলসী। ফল আর ফুলের গাছ লাগিয়ে নাম রেখেছিল 'কুমুদ'।

।। দুই।।

পঞ্চায়েত প্রধান শশাঙ্ক রায় চৌকিদার কুড়ান ভুঁই মালিকে সব গ্রামে তুলসীর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দিতে বললেন। পাঁচ গাঁয়ের প্রায় অর্ধ-শতাধিক ছেলেমেয়ের ধাইমা তুলসী। খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলসীর উঠোনে ভিড় জমে গেল।

শশাঙ্ক আর পুকুরপাড়ের রাস্তা ধরল না। এক রাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে কবিরাজ বাড়ির পিছনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। ফেরার পথে যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই বলেন, তুলসী নেই। সে বিষ্ণুলোকে পাড়ি দিয়েছে।

নোয়াপাড়ার খগেন দত্ত বাজারে যাচ্ছিল। শশাঙ্কর কথা শুনে কেমন যেন থম মেরে যান। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, কাল না পরশু নিমুদের বাড়িতে দেখলাম। ওরা ঢেঁকি ঘরের পাশে জলপাই গাছটি কেটে ফেলেছে। ভেবেছিল তুলসী হালদার জানতে পারবে না। এ পাড়া সে পাড়ায় জ্যান্ত গাছ কাটা হবে আর তুলসী হালদার জানতে পারবে না, তা কখনো হয়? গাছ কাটার খবর বাতাসের আগে তুলসীর কানে পৌঁছে যায়। সে যে পাঁচ গ্রামের পঞ্চাশটি ছেলেমেয়ের ধাইমা!

তাদেরই একজন আন্নাকালীদের বাড়ির পিছন দিয়ে হিজল গাছের নীচ দিয়ে রায়দের পুকুরের পাড় দিয়ে তুলসীর বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল। তুলসী তখন দাওয়ায় বসে চালের কাঁকড় বাছছিল।

— ধাইমা, ধাইমা...

তিন চারটি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বলার চেষ্টা করে।

তুলসী বলে, শুনেছি, বাবা!

নিমু জলপাই গাছটি কেটে ফেলেছে।

তুলসী বলে, চল। আচ্ছা একটু দাঁড়া। গোঁসাইবাবার বাগান থেকে একটা জামরুলের চারা নিয়ে আসি। নিমুর বাড়িতে লাগাব।

জামরুল চারাটি যেখানে জলপাই গাছ ছিল, ঠিক তার পাশে লাগিয়ে তুলসী বলে, নিমু তোর বউকে এক বালতি জল নিয়ে এখানে আসতে বল।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল তুলসী। নিমুর বউকে জামরুল গাছের মাথায় হাত রেখে বলল, বল, জামরুল গাছটিকে আমি নিজের ছেলের মতো মানুষ করব।

গাছটার গোড়ায় এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে হন্ হন্ করে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল তুলসী।

।। তিন।।

এবার আর পুকুরের পশ্চিম পাড় দিয়ে বাড়ি ফিরে যান না শশাঙ্ক। গোপেশ্বর গোঁসাইয়ের উঠোন পেরিয়ে জোড়া তেঁতুল গাছের নীচ দিয়ে কাঁচা সড়ক ধরে ঘরে ফিরে আসেন তিনি। নিজস্ব ইজি চেয়ারে বসে চোখ বোজেন। সঙ্গে সঙ্গে তুলসীর একটা পূর্ণাবয়ব ছবি তাঁর সামনে ভেসে ওঠে। পাঁচ পাড়ার ধাইমা তুলসী। নিজের কোনো সন্তানাদি নেই। বিয়ের পর দুটো বাচ্চা এসেছিল পেটে। কিন্তু তুলসী দশ মাস ধরে রাখতে পারেনি। অনেকদিন চিকিৎসার পর ডাক্তার বলেছিল, আর সন্তান এনো না। কিন্তু নারী মাত্রেই মাতৃকাঙ্ক্ষা থাকে। পাড়ার মোহনী ধাইয়ের কাছে প্রসব বিদ্যা শিখে নিল তুলসী। ক্রমে সেই হয়ে উঠল পাঁচ পাড়ার ধাইমা।

সেই ধাইমা ঘুমের মধ্যেই বিষ্ণুলোকে চলে গেল। কী ভাগ্যই করে এসেছিল সে! ধরতে গেলে কেউ তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেনি। কত ছেলেমেয়ে তার হাতে জন্মেছে। কারও কারও বাড়িতে প্রসূতির সঙ্গে রাত কাটাতো।

একপাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে অন্তত তাকে পাঁচবার ধাইমা ডাক শুনতে হত। ছেলে হোক মেয়ে হোক, আদর করে চলে যেত তুলসী।

শশাঙ্কর স্মৃতি আরও উজানে চলতে থাকে। প্রায় চার দশক আগে শ্যামপুরের তুলসী জেলেপাড়ার গণেশ হালদারের বউ হয়ে এসেছিল। গণেশের চেহারা ছিল পালোয়ানের মতো। শশাঙ্কর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। বেঁটেখাটো গণেশ পৈতৃকবৃত্তিই গ্রহণ করেছিল। সে জেলে। নদীনালা ঝিলে-বিলে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করতো। অনেক সময় তাক্‌লি ফেলে, নোয়াপাড়ার শ্মশানঘাটে গভীর রাত পর্যন্ত একা বসে থাকতো। ভয়ডর বলে কিছু ছিল না তার। অপেক্ষা করে করে তুলসী পিসিকে নিয়ে নদীর ঘাট থেকে ধরে নিয়ে আসতো তাকে। খালি হাতে বড় একটা ফিরতো না গণেশ। কোনোদিন আড় আবার কোনোদিন বোয়াল কাঁধে করে বাড়ি ফিরত। পরের দিন সেই মাছ বাজারে বিক্রি করতো।

কারও বাড়িতে ইষ্টি-কুটুম এলে গণেশের ডাক পড়তো। রায় বা মিত্তিরদের পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরে দিত।

সেই গণেশ হালদার কুমীরডাঙ্গার বিলে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে এল না। ছোট একটা ডিঙ্গি নিয়ে সমুদ্র সদৃশ কুমীরডাঙ্গার কালো জলে মাছ ধরতে গিয়েছিল। সে বিশাল বিল। কালো জল। সাপলা আর পদ্ম দিয়ে ঢাকা। আশপাশে কোনো জনবসতি নেই। বিলের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে আজ পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারেনি। দুঃসাহসিক দু'একজন উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে কেউ নাকি ফিরে আসতে পারেনি।

তুলসী বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, তুমি এই ভরসন্ধায় কুমীরডাঙ্গায় যাচ্ছো! তোমার ভয়ডর কিছু নেই? গণেশ বলেছিল, ভয়ের কী আছে? কাল মিত্তিরবাবুর মেয়ের বিয়ে, মাছ তো দিতেই হবে।

তুলসী বলেছিল— মিত্তিরবাড়ির পুকুর থেকে তো মাছ ধরতে পার!

— সেখানে সব ছোট মাছ।

বলেই বৈঠায় টান দিয়ে ডিঙ্গি ভাসিয়ে দিয়েছিল গণেশ।

ভয় না পেলেও কুমীরডাঙ্গা বিলে পৌঁছানোর পর গণেশের গা ছম্ ছম্ করে। এ বিলের অনেক কাহিনী শুনেছে সে। বিলে পৌঁছানোর পর সেই বহুকথিত ভৌতিক ঘটনাগুলি মনের মধ্যে ভিড় করে। গণেশ একটা বিড়ি ধরায়। কালো জলের উপর দেশলাইয়ের আলোর প্রতিবিম্ব দেখে। সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে, বিলের গভীরে যাবে না। কিন্তু জাল ফেলার পর সেকথা মনে থাকে না। গণেশ শুনেছে, চণ্ডীতলার জমিদাররা বেয়াড়া-বেয়াদব প্রজাদের খুন করে গলায় ইঁট বেঁধে ডুবিয়ে দিত। অনেক জেলের জালে মাঝে মাঝে কঙ্কালও উঠেছে। ভাবতে ভাবতে তারই জালে একটি মেয়েছেলের কঙ্কাল উঠল। ভেবেছিল, বড় একটা মাছ জালে জড়িয়ে গেছে। ওমা! মাছ কোথায়? এ যে দেখছি একটা কঙ্কাল! তাও আবার মেয়েছেলের। কঙ্কালের কব্জিতে কয়েকগাছা সোনার চুড়ি। গলায় একটা সোনার চেইন।

কঙ্কাল দেখে মুহূর্তের মধ্যে মনের সব সাহস উবে যায়। ভয়ে সে কাঠ হয়ে যায়। জাল থেকে কঙ্কালটা ছাড়াবার চেষ্টা করে। তার মনে হয়, কঙ্কালটা দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। যতবার ছাড়াবার চেষ্টা করছে, ততবার কঙ্কালটি তার গলা চেপে ধরছে। কঙ্কালসহ সে বিলের জলে পড়ে যায়। সে ডুবতে থাকে। কিন্তু বিলের তল আর খুঁজে পায় না। কালো গভীর জলে সে ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও গণেশের দেহ উদ্ধার করা যায়নি। কুমীরডাঙ্গার বিলে তার সলিল সমাধি ঘটে গেছে। গণেশ যখন মারা যায় তুলসীর তখন ভরা যৌবন। তার যৌবনের মৌবনে বিপত্নীক ফুলু ঠাকুর উঁকি মারতে শুরু করেছে।

প্রথমদিন আদর আপ্যায়ন করেছিল। দ্বিতীয়দিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু তৃতীয়দিন তুলসী ফুলু ঠাকুরের চোখে কামনার আগুন দেখেছিল। ফুলু ঠাকুর জানতে চেয়েছিল, তুলসী এই জঙ্গলের মধ্যে তুমি একা থাক কী করে?

— এখানে তো ভয়ের কিছু নেই ঠাকুরমশাই। গাছপালাগুলো আমার সঙ্গী। আমি তো ওদের সঙ্গে দিনরাত কথা বলি।

তুলসীর জবাব ফুলুর ভাল লাগেনি।

— গাছ কথা বলে, শোন কথা!

বলেই ফুলু ঠাকুর তার আরও কাছে এগিয়ে যায়। তুলসীর হাত নিজের হাতে টেনে নেয়। তুলসী জ্বলে ওঠে। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। দ্রুত ঘরে ঢুকে বঁটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। ফুলু ঠাকুর পালাবার চেষ্টা করতেই তুলসী তার কাছা ধরে ফেলে।

— কোথায় প্যালাবে, ঠাকুর? আজ তোমাকে মাছের মতো করে কাটবো।

ধুতিটা ছেড়ে দিয়ে নগ্ন ফুলু ঠাকুর রায়বাড়ির পুকুরে ঝাঁপ দেয়। মাঘমাসের শীত, কনকনে ঠাণ্ডা। উলঙ্গ ফুলু ঠাকুর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করে।

— তুলসী, ক্ষমা করে দে। আর কোনোদিন এমন হবে না।

— তোমার ধুতি থাকল। আর কোনোদিন তুলসীর দিকে হাত বাড়িও না।

তুলসী ঘরে গিয়ে নিজের গালে ঠাস করে এক চড় মারে। মর মর, তুলসী তুই মর।

।। চার।।

ভাল সংবাদের গতি অত্যন্ত মন্থর। খারাপ সংবাদ বাতাসের আগে ছোটে। তুলসীর মৃত্যুর খবর খালের ওপারের গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। ঘোষপাড়া, মাহিষ্যপাড়ায় অনেক ছেলেমেয়ের ধাইমা তুলসী। কোনো প্রসূতি সূতিকায়

iitrade
Institute of International Trade

COURSES OFFERED
Bachelors of Business Administration (H)
International Trade Management
Banking & Finance

AFFILIATIONS

WEST BENGAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Utech
NSE

Campus: EN – 27, Salt Lake City; Sector 5, Kolkata – 700 091
Regd. Office: 6, Waterloo Street; Suite # 504, Kolkata – 700 069
Phone: 033-3056-6049 | **Email:** info@iitrade.ac.in | **Web:** www.iitrade.ac.in

ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা
দক্ষিণ কলকাতা জেলার পক্ষ থেকে জানাই
শারদীয়া ও দীপাবলীর প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

সৌজন্যে

সৈকত বক্সী

সভাপতি, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা,
দক্ষিণ কলকাতা জেলা

আক্রান্ত, কোনো মায়ের বুকে দুধ নেই। অথচ বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। তুলসীকে জিজ্ঞাসা করলেই বলে দেবে। নন্দ ঘোষের বউয়ের স্তন দুধে ভারী। বেচারা মৃত সন্তান প্রসব করেছে। মাঝে মাঝে বুক টাটায়। টিপে টিপে ফেলে দিতে হয়। এপাড়া ওপাড়া থেকে বাচ্চা নিয়ে নন্দ ঘোষের বউয়ের দুধ খাইয়ে নিয়ে যায়। নন্দ ঘোষের বউ অপত্যস্নেহে বাচ্চাগুলোকে বুকের দুধ খাওয়ায়। মায়ের বুকের দুধে কোনো জাতপাত নেই। কুতুবের বউ মেয়ে জন্ম দিয়ে মারা গেল। দুর্গা প্রামাণিকের বুকের দুধ খেয়ে সেই মেয়ে বড় হল।

তুলসীর মৃত্যু সংবাদ আশপাশের গ্রামের ছড়িয়ে পড়েছিল। সব গ্রামেই বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল। ধাইমার মৃত্যু সংবাদ শুনে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। তুলসী ছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের ধাইমা।

ইদানিং ধাইমার শরীর খারাপ যাচ্ছিল। তবুও শঙ্করী বলতো, তেমন কিছু চোখে পড়েনি। কখনোই বলতে না, আমার শরীরটা ভাল নেই।

তিনকয়েক আগে রায়পাড়ায় গিয়ে শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসেছে। শঙ্করী জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি কী তোমার সঙ্গে যাব, পিসি?

তুলসী হেসে বলেছিল, কেন, আমার কী হয়েছে? সঙ্গে যাবার কী দরকার? শঙ্করী কথা বাড়ায় না। বলে, সাবধানে যেও।

শঙ্করীর সেনপাড়ায় বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্বামীর ঘর করতে পারেনি। দিনরাত মার খেয়ে একটি মেয়ে নিয়ে বাপের ঘরে ফিরে এসেছিল। শঙ্করীর মাও বেশিদিন বাঁচেনি। শঙ্করী আর তার মেয়েকে নিজের বুকে টেনে নিল তুলসী।

বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন শশাঙ্ক। তুলসীকে দেখে বলেন, ধাইমা এসো। কেমন আছ?

— ভাল আছি, কত্তা।

— বল, তোমার জন্য কী করতে পারি?

তুলসী আঁচল দিয়ে মুখ মুছে, মেঝেতেই বসে।

শশাঙ্কবাবু বলেন, ওই মোড়াটায় বস তুলসী।

তুলসী বলে, একটা পরামর্শ করতে এলাম, কত্তা।

শশাঙ্ক শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হন। মনে মনে ভাবেন, বছর চারেক হল, তুলসী ধাইয়ের কাজ করে না। যদিও বয়স এখনও সত্তর হয়নি। শরীর স্বাস্থ্য তো ঠিকই আছে। শঙ্করীকে ধাই-এর কাজ শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শঙ্করী পারেনি। তুলসীও আর জোর করেনি। সবাই সব কাজ পারে না।

শশাঙ্ক বলেন, তুমি বোধহয় কিছু বলতে চাইছ?

— হ্যাঁ, কত্তা। একটা পরামর্শ করতে এলাম।

— হ্যাঁ, বল!

— বলছি কী কত্তা। গোঁসাইবাবা তো তাঁর বসতভিটা আমাকে দান করে দিয়েছেন। সেখানে প্রায় দু'বিঘার মতো জমি আছে। আমারও প্রায় সম পরিমাণ জমি হবে। তাই বলছিলাম—

— বল, বল!

— আচ্ছা কত্তামশাই, আমাদের এ দিগরে তো কোনো প্রসূতিসদন নেই।

— হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। সেই দশ কিমি দূরে মহেশগঞ্জে একটা প্রসূতিসদন আছে।

তুলসী বলে, বলছিলাম কী কত্তামশাই, আমাদের জমির উপর একটা প্রসূতিসদন গড়া যায় না?

— প্রসূতিসদন! জমি নয় তুমি দিলে, কিন্তু টাকা কোথায় পাবে? টাকা দেবে কে?

তুলসী বলে, জমি পঞ্চায়েতকে দান করে দিতে চাই। পঞ্চায়েতই প্রসূতিসদন করুক। আমাদের এই পাঁচ গাঁয়ে একটা হাসপাতালও নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা আছে বটে, সেখানে নাকি নিয়মিত শিক্ষক আসেন না।

শশাঙ্ক হাসেন, বলেন, তুমি দেখছি সব খবরই রাখ।

তুলসী— আপনি একটা ব্যবস্থা করুন, কত্তা।

শশাঙ্ক বলেন, সাধু প্রস্তাব। একটা প্রসূতি সদন হলে গাঁয়ের মানুষের খুব উপকার হবে। আমি জেলা পরিষদের সভাপতির সঙ্গে কথা বলব।

তুলসী বলে, আরও একটা কথা আছে, কত্তা।

বলেই সে শশাঙ্কের সামনে এগিয়ে যায়। বলে, কত্তা, আমারও তো বয়স হচ্ছে।

শশাঙ্ক ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হেসে বলে, তা হচ্ছে—

তুলসী বলে, আমার একটা নিবেদন আছে, কত্তা।

— বল, বল।

— আমি মরে গেলে আমাকে কুমীরডাঙ্গার বিলে ডুবিয়ে দেবেন। উনিও তো সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

তুলসীর প্রস্তাব শুনে কেমন যেন নির্বাক হয়ে যান শশাঙ্ক। বেঁটেখাটো গণেশের চেহারাটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠে।

তুলসীর দিকে তাকিয়ে শশাঙ্ক বলেন, তাই কী হয় তুলসী?

Phones : Fac : 2222224, 2222225,
2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

Chander Bhan
Suraj Bhan

Phone : (O) 2461423, 3294291, (F) 2850492
Mob. 9319224997
Tele Fax : 2461423, (STD-0562)

AMAR MARKET,
JOHRI BAZAR, AGRA-3
Manufacturers of

All Kinds of Handloom,
Durries and Carpets etc.

SAHARA®

Air Coolers, Storage Water Heaters,
Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans,
Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :
SAHARA Electrical Appliances
D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

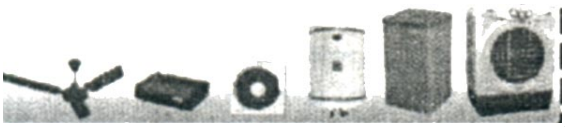

011-32306597
011-30306592

SRE

SNEH RAMAN
ELECTRICALS PVT. LTD.

E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park,
Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

কেন এই ধর্ষণবন্যা ?

তথাগত রায়

পুজো সংখ্যা স্বস্তিকায় ধর্ষণের মতো এরকম একটা বিতৃষ্ণাদায়ী বিষয় নিয়ে লিখতে প্রথমে ইতস্তত হয়েছিল। তারপর মনে হল, এই বিষয়টি আজকে পশ্চিমবঙ্গে এমন উৎকট আকার ধারণ করেছে যে, এটা নিয়ে আলোচনা করাই উচিত। কয়েকদিন আগে এক ভদ্রলোক— অর্ধেক খেদের সঙ্গে, অর্ধেক ঠাট্টার সুরে বলছিলেন, আজকে যা অবস্থা, খবরের কাগজে বোধহয় ধর্ষণের জন্য একটা আলাদা পাতার ব্যবস্থা করবে (যেমন খেলার পাতা, সম্পাদকীয় পাতা ইত্যাদি)। এই ব্যাপারটা নতুন মাত্রা পেয়েছে তাপস পাল নামক এক মানুষের চেহারাধারী সারমেয়র বিবমিষা উদ্রেককারী উক্তিতে।

ইদানীংকালের মধ্যে দিল্লীতে নির্ভয়ার ধর্ষণ এবং পশ্চিমবঙ্গে কামদুনির ধর্ষণকাণ্ডে ধর্ষণের সঙ্গে মেয়েটির উপর পৈশাচিক অত্যাচার অনেকেরই নজর কেড়েছে এবং প্রচুর আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে। এই সব ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে অবশ্য এই জঘন্য অপরাধ নিবারণ করার উপায় সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সিদ্ধান্তে আসতে গেলে, যা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে আশু প্রয়োজন— সুবিন্যস্ত আলোচনা প্রয়োজন এবং এই প্রবন্ধে তারই চেষ্টা করা হবে। মোটামুটি যে সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হবে তা হল কি মানসিকতা থেকে মানুষ ধর্ষণে প্রবৃত্ত হয়, ধর্ষণ সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজে কি রকম অনুশাসন বিদ্যমান— বর্তমানে ও অতীতে। বর্তমানে এই অপরাধটির কথা এত বেশি শোনা যাচ্ছে কেন এবং সবশেষে কি করলে এই সামাজিক ব্যাধিটাকে দূর করা সম্ভব।

মোটামুটিভাবে ধর্ষণ মানে পুরুষ দ্বারা অনিচ্ছুক নারীর উপর যৌন আক্রমণ। এই আক্রমণের মূলে নিশ্চয়ই কামপ্রবৃত্তি। কিন্তু কারুকে ধর্ষণে প্রবৃত্ত করার জন্য কামপ্রবৃত্তিই যথেষ্ট নয়। কামপ্রবৃত্তি মানুষের একটি স্বাভাবিক ঝোঁক, প্রজননের জন্যই মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা এই প্রবৃত্তি দিয়েছেন। পরবর্তীকালে

সমাজ এই প্রবৃত্তিকে বশে রাখার জন্য বিবাহ এবং অন্যান্য অনুশাসন জারি করেছে। যা নিয়ে আলোচনা এই নিবন্ধে হবে। কিন্তু আগে বোঝা দরকার, কিসে তাড়িত হয়ে মানুষ এই কামবৃত্তির এতটা বশীভূত হয় যে কোনো অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে সে এই রকম অসামাজিক যৌন আক্রমণ এবং সঙ্গে অন্যান্য বিকৃতির প্রকাশ ঘটায়।

এই ধরনের বিকৃত আচরণের নানা কারণ আছে। আগে মনে করা হত, মানুষ নিজের প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে না পেরেই এই কাজ করে। কিন্তু কালক্রমে মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, এই ধারণা ঠিক নয়। প্রবৃত্তি বশে রাখতে না পারা তো বটেই, কিন্তু এই আচরণ করতে হলে আরও কিছু উপাদান দরকার হয়, যা সাধারণ, স্বাভাবিক, অপরাধবিমুখ মানুষের মধ্যে থাকে না। এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে এই কারণে, যে প্রায়ই দেখা যায় ধর্ষণকারী মেয়েটিকে শুধু ধর্ষণ করে তুষ্ট হয় না, তারপর তাকে নানারকম পৈশাচিক যন্ত্রণাও দিয়ে থাকে। এই চেহারা আমরা দেখেছি কলকাতায় হেতাল পারেখ নামক মেয়েটির ধর্ষণ ও খুনে। দিল্লীতে নির্ভয়ার ধর্ষণ পরবর্তী পৈশাচিকতায় (যার ফলে চিকিৎসকদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো যায়নি), কামদুনির ধর্ষণ ও পরবর্তী বীভৎসতায়।

তাহলে কি এই বিকৃত আচরণের কারণ? নিম্নলিখিত কারণগুলির প্রতি সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকরা অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন—

১। স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতা।

২। কারুর উপর জোর খাটাবার 'ডমিনেট' করার আকঙ্ক্ষা।

৩। কর্মহীনতা, কুসঙ্গ ও বিবাহের মাধ্যমে স্বাভাবিক যৌনকামনা তৃপ্ত করতে না পারা।

৪। অশ্লীল ডিভিডি ও পত্রপত্রিকা পড়া ও মাদকের প্রভাব।

৫। ভোগবাদের হাতছানি ও নারীর প্ররোচনা।

৬। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ও মূল্যবোধঘটিত সমস্যা।

৭। ধরা না পড়ার আশ্বাস, ধরা পড়লে জামিন পাবার আশ্বাস।

৮। আইনি পরিপ্রেক্ষিত।

স্বাভাবিকভাবে যারা অপরাধপ্রবণ তারা পকেট মারা থেকে খুনজখম বা দলিল জাল, তহবিল তছরূপ— সবই করতে পারে। 'সিরিয়াল কিলার' বা পরের পর হত্যাকারী, বা যারা কোনো কারণ ছাড়াই হত্যা করে তারাও এই শ্রেণীতে পড়ে। এরা মূলত সমাজবিরোধী এবং কোনো মহিলার নিরাপত্তা এরা সমাজের কাজ হিসেবেই দেখে এবং তাকে উড়িয়ে দিতে প্রবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয় কারণটি অর্থাৎ 'ডমিনেট' করার ইচ্ছে অনেক আপাত-স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে থাকে। এর মধ্যে যারা আর্থিক বা শারীরিক কারণে পিছিয়ে থাকে, তারা এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ খোঁজে অসহায়া নারীকে বা শিশুকে ধর্ষণ করে। এই আচরণ মহিলাদের মধ্যেও দেখা যায় এবং তাদের এই প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে বাচ্চাদের বা গৃহভৃত্যদের যন্ত্রণা দিয়ে। নিজের সন্তানকে মানুষ মা হয়ে কতটা যন্ত্রণা দিতে পারে সেটা এই মহিলাদের আচরণ থেকে বোঝা যায়। পুরুষের মধ্যে এর প্রকাশ সাধারণত ঘটে নারীধর্ষণে এবং ধর্ষণ-পরবর্তী বীভৎসতার মধ্যে।

কর্মহীনতা কত বড় অভিশাপ তা যাঁরা এর মধ্যে দিয়ে গেছেন তাঁরাই জানেন। একজন সমর্থ পুরুষের পক্ষে কোনো কাজ না করে বসে থাকা, কোনো উপার্জন করতে না পারা এক ধরনের হীনতার জন্ম দেয়, যাকে ইংরাজিতে বলে ফ্রাসট্রেশন। এর সঙ্গে যদি যোগ হয় কু-সঙ্গ (যা কর্মহীন অবস্থায় হওয়াই স্বাভাবিক), তাহলে যৌবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করার জন্য ধর্ষণ একটি সহজলভ্য উপায় বলে মনে হতেই পারে। দুঃখের বিষয়, বেকারি যে একটা কত বড় অভিশাপ এবং এরাজ্যের সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা আমরা ভুলে বসে আছি এবং বেকারিকে একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে মেনে নিয়েছি। এই বেকারির স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে বিয়ে করতে না পারা— তাতে যে সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় তা বলাই বাহুল্য।

পুলিশ ও সমাজতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে জানা যায়, ধর্ষণের অপরাধীরা ধরা পড়ার পরে তাদের কাছ থেকে প্রায় অবধারিতভাবে অশ্লীল পত্রপত্রিকা, সিডি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এই দুটো জিনিসের সংযোগ বোঝা কঠিন নয়, কিন্তু সমস্যা হয়েছে কি করে এই ধরনের পত্রিকা বা ভিডিও-র প্রচার ঠেকানো যায় তাই নিয়ে। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন পৃথিবীর সব তথ্য ঘরে বসে পাওয়া যায় এবং ইন্টারনেট পার্লারগুলো এখন অশ্লীল ছবি ও ভিডিও দেখিয়েই চলে। ধর্ষণ প্রবৃত্তির সঙ্গে মাদকের সম্পর্ক প্রায় স্বতঃসিদ্ধ।

ভোগবাদের হাতছানি এবং নারীর প্ররোচনা— এই দুটো সম্ভবত ধর্ষণের কারণ হিসেবে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়। এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভোগবাদী জীবনদর্শন মানুষকে আরও বেশি আরও আরও বেশি ভোগ করতে প্ররোচিত করে এবং সেই ভোগ করার ইচ্ছের মধ্যে কাম-তাড়নার একটা বড় জায়গা নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এর বিকল্প কি? আমরা যদি আজকের যুব সম্প্রদায়কে প্রাচীন ভারতের মতো ব্রহ্মচর্য পালন করতে বলি, তাহলে তারা তা শুনবে না। যুগধর্ম বলে একটা জিনিস আছে এবং সেই যুগধর্মের চাপেই তারা শুনবে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার চেষ্টা না করে কোনাকুনি সাঁতার কাটা। সেটা কীভাবে সম্ভব এই প্রবন্ধে পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নারীর প্ররোচনায় ধর্ষণ— এই তত্ত্বটি পুরুষের কাছে খুব লোভনীয়। কারণ এতে শুধু আইন বাঁচানো যায় না, এমনকী বিবেকও পরিষ্কার রাখা সম্ভব হতে পারে। এ কথা সত্য যে, প্ররোচনামূলক পোশাক বা আচরণ রিরংসা জাগ্রত করতে পারে।

ধর্ষণের প্রতিবাদে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল।

কিন্তু সেই রিরংসা কি ধর্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে? শ্লীলতাহানি পর্যন্ত নিশ্চয়ই পারে— কিন্তু শ্লীলতাহানি থেকে ধর্ষণ একটা বিরাট লাফ। ইদানীংকার অভিজ্ঞতা যা বলছে, তা কিন্তু এই প্ররোচনা তত্ত্বকে সমর্থন করে না। সাম্প্রতিক দুটি বীভৎসতম ধর্ষণের কাণ্ডে— অর্থাৎ নির্ভয়া এবং কামদুনি— মেয়েটির পরনে বা আচরণ অশ্লীলতা ছিল এমন কথা কখনো শোনা যায়নি। কামদুনির মেয়েটি তো অত্যন্ত ছা-পোষা গ্রাম্য ঘরের মেয়ে। বস্তুত, প্ররোচনাদায়ক পোশাক যারা পরে তারা বেশিরভাগ উচ্চবিত্ত পরিবারের, ধর্ষণকারীরা তাদের কাছে পৌঁছতেই পারে না। অতএব অন্তত এই প্রবন্ধকারের নিবেদন, এই প্ররোচনার তত্ত্বটি সঠিক নয়।

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও মূল্যবোধঘটিত সমস্যা যে ধর্ষণের অন্যতম উপাদান সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এটা সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট হয় যদি আমরা ধর্ষণের স্থান এবং পাত্রের দিকে তাকাই। একথা অনস্বীকার্য যে ধর্ষণের প্রবণতা উত্তর ও পূর্ব ভারতে বেশি। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে অনেক কম। ইদানীং বেঙ্গালুরুতে ধর্ষণের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে বটে, কিন্তু বেঙ্গালুরু সর্বভারতীয় শহর, সেখানে সব রকমের মানুষ থাকেন। এই প্রবন্ধকার স্বচক্ষে দেখেছে, আমেদাবাদে রাত দশটার সময় অল্পবয়সী মেয়েরা গয়নাগাঁটি পরে স্বচ্ছন্দে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

উত্তর ও পূর্ব ভারতে এই বিকৃত মানসিকতার কারণ, এই লেখকের বিনীত নিবেদন, ইসলামী বিচারধারার সংক্রমণ। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী মূলত পুরুষের ভোগের বস্তু এবং পুরোপুরি মানুষ নয়। এই কথা লেখার মধ্যে ইসলামের প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করা হচ্ছে না, সত্যটা খোলাখুলিভাবে বলা হচ্ছে, যা ভারতের ভণ্ড সেকুলারবাদের আবহাওয়ায় বলা বারণ। যেমন কোনো পুরুষ যদি পুণ্যকর্ম করেন এবং আল্লা তাঁকে স্বর্গবাসের অনুমতি দেন, তবে তিনি স্বর্গে গিয়ে (জন্নত বা বেহেস্‌ত) যা পাবেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রচুর সংখ্যায় 'হুর' বা আনতনয়না অনাঘ্রাতা সুন্দরী যুবতী। যাদের যৌবন চিরস্থায়ী এবং যাদের সঙ্গে যৌনক্রীড়ার অবাধ অনুমতি আছে। কিন্তু কোনো নারী যদি পুণ্যকর্ম করেন তবে তিনি কোথায় যাবেন, কি পাবেন, সে সম্বন্ধে কিছু লেখা নেই। এই প্রবন্ধকার ইসলামী পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করেও কোনো সদুত্তর পাননি। আরও যেমন কোরানের চতুর্থ সুরা (সুরা নিসা) ৩৪তম আয়াতে রয়েছে, মেয়েরা হবে পুরুষের অনুগত। এবং যদি তারা না মানে তাহলে তাদের মারধোর করারও বিধান রয়েছে। আরও রয়েছে, তোমার পত্নীরা তোমার কৃষিক্ষেত্র, সেখানে চাষ করার জন্য তুমি যখন খুশি যেতে পার (সুরা বাকারা, আয়াত ২২৩)। তালিকা দীর্ঘতর করে লাভ নেই।

যেখানে একজনের ধর্ম একজন পুরুষকে নারীজাতির সম্বন্ধে এই ধারণা তৈরি করে দেয়, সেখানে যে ধর্ষণের প্রবৃত্তি জন্ম নেবে তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুত পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যাবে বেশিরভাগ ধর্ষণের আসামিই মুসলমান সম্প্রদায়ের। আমাদের দেশে যে ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ বাতাবরণ বিদ্যমান তাতে এই সব কথা বলা বা লেখা কড়া বারণ। যদিও এই প্রবন্ধকারের ক্ষুদ্র মাথায় আজ পর্যন্ত ঢোকেনি কেন বারণ? যদি একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমস্যা থাকে তাহলে সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে তার সমাধান করার চেষ্টা করাই তো উচিত। কিন্তু না, ভারতীয় ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতা বলছে, সমস্যার কথা বলাই চলবে না। যদিও অসুখ হয়েছে তাই স্বীকার না করা হয় তাহলে চিকিৎসা হবে কি করে?

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ধর্ষণের প্রকোপ কম, কারণ উত্তর ও পূর্ব ভারতের তুলনায় এখানে ইসলামী বিচারধারার সংক্রমণ অনেক কমে ঘটেছে।

আইনি পরিপ্রেক্ষিতে এবং ধরা না পড়ার আশ্বাস ধর্ষণে প্ররোচনা দেয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে আইনের সঙ্গে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও মিশে আছে। আমাদের হিন্দু সমাজে যে সব কুপ্রথা চালু ছিল তার মধ্যে অন্যতম হল ধর্ষিতা নারীকে 'অপবিত্র' বলে পরিত্যাগ করা। সেক্ষেত্রে মেয়েটির সামনে বিকল্প ছিল যৌনকর্মবৃত্তি অবলম্বন করা। মুসলমান হয়ে যাওয়া বা আত্মহত্যা করা। নোয়াখালির কুখ্যাত ১৯৪৬ সালের

"সবাই সুখি হোক,
সকলে ভালো থাকুন,
সকলে নীরোগ থাকুন,
কেউ যেন দুঃখ না পায়"

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও
ভালোবাসা সহ—

ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা–
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা—

গৌরাঙ্গপাড়া টাঙ্গাইল তন্তুবায়সমবায় সমিতি লিমিটেড

টাঙ্গাইল শাড়ি প্রস্তুতিকারক (পাইকারী ও খুচরো বিক্রেতা)

অফিস

মধ্য নসরৎপুর, পো: নসরৎপুর

জেলা - বর্ধমান

শ্রী রণজিৎ বসাক, সম্পাদক,

ফোন : ৯৯৩২৪৮৬১৯৫

ধর্ষণকারীদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ।

হিন্দুনিগ্রহের সময়ে ব্যাপক আকারে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুনারীর ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। এর পিছনে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এই সব নারীকে হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা। অনুরূপভাবে, বহু মানুষকে জোর করে গোমাংস খাইয়ে দেওয়া হত। এই সময় হিন্দুসমাজ দেখেছে এক মহাপুরুষের কাজ, যাঁর নাম ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী মাধবানন্দ ও বিভিন্ন পণ্ডিত সমাজের সম্মতি নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। যার অন্যতম মর্মার্থ ছিল জোর করে কারুকে গোমাংস খাইয়ে দিলে বা ধর্ষণ করলে তার সমাজচ্যুতি হতে পারে না। ধর্ষিতা হিন্দু নারীদের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন এই সব মেয়েদের খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। শ্যামাপ্রসাদের এই সমাজ সংস্কারের ভূমিকা তেমন প্রচার পায়নি।

কিন্তু এই সামাজিক কু-অনুশাসনের ফলে যা হত, তা হল পারতপক্ষে মানুষ ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে পুলিশে নালিশ করতেন না। এবং এই নালিশ না করা নিঃসন্দেহে ধর্ষণকারীদের সাহস জোগাত। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগের শাসনকালে (১৯৩৭-৪১, ১৯৪৩-৪৭) পুলিশের ধর্মীয় পক্ষপাতও অনুরূপভাবে ধর্ষকদের উৎসাহ দিয়েছে। পার্ক স্ট্রীট, কাটোয়া, কামদুনি ইত্যাদি ধর্ষণের ঘটনা দেখে এখন মনে হচ্ছে সেই সব দিন আবার ফিরে এসেছে।

এই কুৎসিত অপরাধটির সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে একবার আলোচনা করতে হবে, ধর্ষণের প্রবণতা কি কোনোভাবে কমানে সম্ভব?

আইনশৃঙ্খলার উন্নতি, কড়া শাস্তির ব্যবস্থা এবং ধর্ষণের মামলার নিভৃতে (ইন ক্যামেরা) শুনানি নিশ্চয়ই এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করবে। ১৯৯৬ সালের একটি রায়ের মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ধর্ষণের মামলার শুনানি যেন নিভৃতে হয় এবং আসামির উকিলকে যেন এমন প্রশ্ন করতে না দেওয়া হয় যা ধর্ষিতা নারীকে বিপর্যস্ত করবে। কিন্তু এমন কি কিছু করা সম্ভব যা ধর্ষণের প্রবৃত্তিকেই কমিয়ে দেবে?

স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু করা অসম্ভব। কিন্তু যোগশাস্ত্রের পণ্ডিতরা বলেন, যোগের মাধ্যমে মানুষের কু-প্রবৃত্তি কমানো সম্ভব। এটা সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই। কারণ, যোগের ফলে কারও ক্ষতি তো হতে পারে না।

মূল্যবোধ যদি যথাযথভাবে তৈরি করা যায়, যদি নারীর সম্মানরক্ষা একটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় জায়গায় এবং নারীর ধর্ষণকে একটা অত্যন্ত নোংরা জায়গায় নিয়ে আসা যায়, তবে নিঃসন্দেহে ধর্ষণের প্রবণতা কমতে পারে। কিন্তু এই জিনিস সময়সাপেক্ষ এবং ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে এর সংঘাতের সম্ভাবনা আছে।

তবে একমাত্র মূল্যবোধ তৈরি করেই বর্তমান যুগধর্মের প্রতাপ সত্ত্বেও আজকের যুবসম্প্রদায় ব্রহ্মচর্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে।

এর সবক'টি নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। ততদিন নারীজাতি নিরাপদ নন— বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে।

॥ মহর্ষির প্রার্থনা ॥

হে পরমাত্মন্। আমাদের এই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল কর। তোমার এইসকল দুর্বল সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই— ইহা নানা ক্লেশ নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হইতেছে— দিনরাত্রি ইহার ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি এদেশকে উদ্ধার কর।

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

A WELL WISHER

ঈশ্বরই বস্তু,

আর সব অবস্তু

—শ্রীরামকৃষ্ণ

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

সর্বদা ইষ্ট চিন্তা করলে, অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে। —মা সারদা

—জনৈক শুভানুধ্যায়ী

।। 'কথামৃত' যেমন বুঝেছি।।

যত মত তত পথ
(কিন্তু) ধরতে হবে একটা পথ।

সর্বধর্ম সমন্বয়
(তবে) নিজের ধর্ম বাদ দিয়ে নয়।

খালি পেটে ধর্ম হয় না
(আবার) ধর্ম ছাড়া পেট ভরে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়তে থাকুন।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ (চতুর্বর্গ) লাভ করুন।

সৌজন্যে :—
আশিস কুমার মঙ্গল
৩৩ নং, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৬